নবী মুহাম্মদ সা. এর আগমনের প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য, দা‘ওয়াতের পদ্ধতি ও কৌশল

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

ড. মো: আবদুল কাদের

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2012 - 1433

IslamHouse.com

﴿ محمد صلى الله عليه وسلم: خلفية بعثته، وحكمة إرساله، وطرق دعوته ﴾

« باللغة البنغالية »

د/ محمد عبد القادر

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2012 - 1433

IslamHouse.com

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের উদ্দেশ্য এবং দা'ওয়াত পদ্ধতি ও কৌশল

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মহান আল্লাহ তা 'আলা সত্য দীন সহকারে মানবজাতির মুক্তি ও কল্যাণের পথ নির্দেশক হিসেবে সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক রূপে পাঠিয়েছেন। নবুওয়ত প্রাপ্তির পর থেকে নয় বরং জন্মলগ্ন থেকেই তিনি ছিলেন আদর্শের মূর্ত প্রতীক। বাল্যকাল থেকেই আল্লাহ তাকে তাঁর দীনের জন্য প্রস্তুত করে নেন। চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তায় তিনি ছিলেন এক অনন্য ও ব্যতিক্রমধর্মী আদর্শবান বালক । আল্লাহ প্রথম থেকেই তাঁকে মহান দা 'ওয়াতের জন্য উত্তম চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষন দিয়েছেন। অতএব, তাঁর দা'ওয়াত ছিল হিকমত ও কৌশলপূর্ণ।

সমকালীন আরবের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা

ইসলাম আল্লাহ তা 'আলার একমাত্র মনোনীত দীন। এটি এক আল্লাহর একত্ববাদ ও সার্বিক বিষয়ে তাঁর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি

দিয়ে থাকে। যুগে যুগে প্রেরিত সকল নবী -রাসূল এ দীনের পতাকাবাহী ছিলেন।[1] অতএব, আল্লাহ তা'আলার নিকট একমাত্র ও গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ وَمَا ٱخۡتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ١٩ ﴾ [ال عمران: ١٩]

"নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। অতএব, যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করবে তা কখনো আল্লাহর নিকট গ্রহনযোগ্য হবে না। আর পারলৌকিক

---

[1] সকল নবী-রাসূলের ধর্ম ছিল আল-ইসলাম। তাঁরা সবাই এ জীবনাদর্শের অনুসারী ছিলেন এবং স্ব স্বজাতিকে এ আদর্শের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। নূহ আলাইহিস সালাম ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ইয়াকুব আলাইহিস সালাম, ইউসূফ আলাইহিস সালাম , সুলায়মান আলাইহিস সালামও মূসা আলাইহিস সালাম সহ সকলের বক্তব্যে এটি পরিদৃষ্ট হয়। আল-কুরআন , সূরা ইউনুস : ৭২ ; সূরা আল-বাকারা : ১২৮ , ১৩২; ইউসূফ : ১০১ ; আন্ নমল : ৩০-৩১, ইউনুছ : ৮৪।

জীবনে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। ”[2] কিন্তু এ জীবনব্যবস্থা যুগে যুগে বিভিন্ন সময়ে বিকৃত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। ফলে সর্বশেষ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে বিভিন্ন রকমের জাহেলী কুসংস্কারে এটি ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। এসময়ে বিভিন্ন ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। পূর্ববতী নবী-রাসূলগণের অনুসারীদের মধ্য হতে বিকৃত, পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত হয়ে ইয়াহূদী, খৃস্টান, অগ্নিপুজক প্রভৃতি জাতি ও গোষ্টীর সূচনা হয়। এগুলো বিশেষত: আরব, রোম, পারস্য, হিন্দুস্থান ও চীনদেশে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। [3] এ ধরনের অধঃপতনের অন্যতম কারণ ছিল ঈসা আলাইহিস সালাম-এর পৃথিবী থেকে উত্থিত হয়ে যাওয়ার পর থেকে ৫৭০ বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন নবী-রাসূলের আবির্ভাব না হওয়া। [4] ঐতিহাসিকগণ সে সময়কে আইয়্যামে জাহেলিয়্যা বলে আখ্যায়িত

---

[2] আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান : ১৯।

[3] ড. আব্দুর রহমান আনওয়ারী, *মানহাজুদ দা 'ওয়াহ ওয়াদ দু 'আত ফিল কুরআনিল কারীম*, (অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি. থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ১৯৯৮), পৃ. ৮৭৬।

[4] তাহের সূরাটী, *প্রাগুক্ত*, ৫১৫।

করেছেন।[5] আইয়্যাম অর্থ যুগ। আর জাহেলিয়্যা অর্থ মূর্খতা , অজ্ঞতা ও সভ্যতা বিবর্জিত। ব্যাপক অর্থে কুসংস্কার, বর্বরতা, ধর্মহীনতা।[6] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব কিংবা হিজরতের পূর্বে এক শতাব্দী পর্যন্ত আরব অধিবাসীদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ড ওহী সমর্থিত ছিল না বিধায় ঐ সময়টাকে আইয়ামে জাহেলিয়্যাহ বলা হয়।[7]

---

[5] ড. ওসমান গনী, *মহানবী,* (কলিকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৬), পৃ. ১০৯ ; মুহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোস্তফা চরিত,* (কলিকাতা : রনি এন্টারপ্রাইজ, ১৯৮৭ খৃ.), পৃ. ১৪৯ ; ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল , *মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন চরিত* , অনু: মাওলানা আব্দুল আউয়াল , (ঢাকা : ইসলামিক ফাইন্ডেশন, ১৯৯৮ খৃ.), পৃ. ৮১ ; P.K Hitti, *History of the Arabs,* (London : Macmillan Education Ltd, 1986), p. 3 .

[6] ড. ইবরাহীম মাদকুর, *আল-মু'জামুল ওসীত,* (দেওবন্দ : ইউপি , তা.বি) পৃ. ১৪৪ ; মনির আল-বা 'লাবাক্কি, *আল-মাওরিদ,* (বৈরুত: দারুল ইলম্ লিল মালাঈন, ১৯৭৬ খৃ.) , পৃ. ২৪৮ ; Thomas Patrick, Dictionary of Islam , (India: Cosmo Publication, 1986), opcit, p. 224.; আল-কুরআনে জাহেলিয়্যাহ শব্দটি চারবার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন , ৩:১৫৪ ; ৫:৫০ ; ৩৩: ৩৩ ; ৪৮: ২৬।

[7] P.K Hitti, *History of the Arabs,* (London : Macmillan Education Ltd, 1986), p. 87 .

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের সময় তৎকালীন আরবের লোকেরা ধর্মীয় দিক থেকে সবচেয়ে খারাপ ও নিকৃষ্ট অবস্থানে পৌঁছে গিয়েছিল । এসময় তাদের ধর্ম বিশ্বাসে শির্ক, মুর্তিপূজা, গ্রহ-নক্ষত্র, দেব-দেবী, পাহাড়-পর্বত, পশু-পক্ষী, পাথর, ইত্যাদির উপাসনা বিরাজমান ছিল। এভাবে মানুষ এক আল্লাহর স্থলে বহু প্রভূর উপাসনার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সমকালীন আরবের ধর্মীয় অবস্থাকে নি ম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে বিশ্লেষণ করা যায়।

১. শির্কের প্রচলন

শির্ক-এর শাব্দিক অর্থ অংশীদার স্থাপন করা , ঈমান কিংবা ইবাদতে অংশীদার করা।[8] যারা আল্লাহর সাথে শির্ক স্থাপন করত তাদের মুশরিক বলা হয়। এটা তাওহীদের বিপরীত। তারা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করত না ; তাদের বেশিরভাগ লোক আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করত; কিন্তু তাঁর সাথে ইবাদতে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করত। এমর্মে পবিত্র কুরআনে এসেছেঃ

---

[8] ড. মুহাম্মদ ফজলূর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩১।

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝٦١ ﴾ [العنكبوت: ٦١]

"যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন , কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ , তাহলে তা দেরকে কোথায় ঘু রিয়ে দেয়া হচ্ছে।"[9]

এছাড়াও তারা বিশ্বাস করত যে , আল্লাহ তা'আলাই আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন , যমীনকে জীবিত করেন , এবং মৃতকে জীবিত করেন, তদুপরি তারা শরিক স্থাপন হতে বিরত থাকত না।[10]

---

[9] আল-কুরআন, সূরা আনকাবুত : ৬১।

[10] পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝٦٣ ﴾ [العنكبوت: ٦٣]

কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে

﴿فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۝٦٥ ﴾ [العنكبوت: ٦٥]

অন্যত্র আরও বলা হয়েছে

মোটকথা: তারা আল্লাহর রুবুবিয়তে বিশ্বাস পোষণ করত কিন্তু সেক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তির উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন উপাস্যের ধারণা করত, যেগুলোকে তাদের উপকারী , ক্ষতিসাধনকারী, অস্তিত্বদানকারী ও ধ্বংসকারী বলে মনে করত ।[11] এগুলোর ইবাদতে তাঁরা নিয়োজিত হত এ প্রত্যাশায় যে , এগুলো আল্লাহর নৈকট্য লাভে তাদের জন্য সুপারিশকারী হবে। পবিত্র কুরআনে তাদের আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে এসেছে,

﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ ٣﴾ [الزمر: ٣]

﴿ قُلۡ مَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أَمَّن يَمۡلِكُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَمَن يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُۚ فَقُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣١ ﴾ [يونس: ٣١]

আল-কুরআন, সূরা আনকাবুত : ৬৩ ও ৬৫; সূরা ইউনুস : ৩১।

[11] আবুল হাসান আলী আন্ নদভী , *সিরাতুন নববীয়্যাহ*, (লখনৌ: মাজ 'মা ইসলামী 'ইলমী, তা.বি), পৃ. ৩০।

“যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে , আমরা তাদের ইবাদত এজন্যই করি , যে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে।”[12]

তাছাড়া তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর রুবুবিয়াত তথা আল্লাহর সত্ত্বা, তার কর্মকাণ্ড ও গুণাগুণেও শির্ক করত। তাই তো দেখা যায়, আ রবের মুশরিকরা ফেরেশ্তাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যায়িত করত। “জ্যোতিষির”[13] কথার উপর ছিল তাদের পূর্ণ আস্থা।[14] জ্যোতিষিরা কিছু জিন হাসিল করে তাদের মাধ্যমে বহু কল্পিত , মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী করে জনসাধারণ হতে বহু অর্থ উপার্জন করত। মূলতঃ এটা ছিল তাদের উপার্জনের মাধ্যম।

---

[12] আল-কুরআন, সূরা আয্-যূমার : ৩।

[13] জ্যেতিষী সেসব লোককে বলা হতো , যারা নক্ষত্রের গতি সম্পর্কে গবেষণা করতো এবং হিসাব-নিকাশ করে বিশ্বের ভবিষ্যত ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করতো। (মোল্লা আলী ক্বারী , *মিরকাতুল মাফাতিহ শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ,* ২য় খন্ড, (লক্ষ্ণৌ : তা.বি), পৃ. ৩)।

[14] তাহের সূরাটী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫১৩।

মানুষকে ধোঁকা দিয়ে টাকা পয়সা লুট করাই ছিল তাদের পেশা।[15]

২. মূর্তিপূজা

আরবের মুশরিকদের বিভিন্ন গোত্র বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা করত। তারা গাছ, পাথর ও মাটি দিয়ে বিভিন্ন মানুষ বা প্রাণীর

---

[15] আমর ইবন লূয়াই বনু খোজা'আ গোত্রের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ছোটবেলা থেকে এ লোকটি ধর্মীয় পূণ্যময় পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছিল। ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে তার আগ্রহ ছিল অসামান্য। সাধারণ মানুষ তাকে ভালবাসার চোখে দেখতো এবং নেতৃ স্থানীয় ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে মনে করে তার অনুসরণ করতো। এক পর্যায়ে এ লোকটি সিরিয়া সফর করে। সেখানে যে মূর্তিপূজা করা হচ্ছে সে মনে করলো এটাও বুঝি আসলেই ভাল কাজ। যেহেতু সিরিয়ায় অনেক নবী আবির্ভূত হয়েছেন এবং আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে। কাজেই সিরিয়ার জনগণ যা করছে সেটা নিশ্চয় ভালো কাজ এবং পূণ্যের কাজ। এরূপ চিন্তা করে সিরিয়া থেকে ফেরার পথে সে 'হুবাল' নামের এক মূর্তি নিয়ে এসে সেই মূর্তি কা 'বাঘরের ভেতর স্থাপন করলো। এরপর সে মক্কাবাসীদের মূর্তিপূজার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে শির্ক করার আহবান জানালো। মক্কার লোকেরা ব্যাপকভাবে তার ডাকে সাড়া দেয়। মক্কার জনগণকে মূর্তিপূজা করতে দেখে আরবের বিভিন্ন এলাকার লোকজন তাদের অনুসরণ করলো। কেননা, কা'বাঘরের রক্ষাণাবেক্ষনকারীদের বৃহত্তর আরবের লোকেরা ধর্মগুরু মনে করতো। (শায়খ মু ?হাম্মদ ইবন আব্দুল ওহাব নজদী, *মুখতাছারুস সীরাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২)।

ছবি তৈরী করত। মূর্তির সাথে তাদের এক ধরনের ভালবাসা জন্মে গিয়েছিল। বনু খোজা ‘আ গোত্রের সরদার আমর ইবনে লোহাই নামক এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম আরবদের মধ্যে মূর্তির প্রচলন করেছিলেন।[16] অবশ্য তার পূর্বেই নূহ আলাইহিস সালাম-এর সময়ে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজার সূচনা হয়।[17] তাদের দেবতাদের মধ্যে

---

[16] সর্বপ্রথম ‘কাওমে নূহ’ মূর্তিপূজার প্রচলন করেছিল। তারা ওয়াদ , সুত্তয়া, ইয়াগুছ, ইয়া‘উক ও নসর নামক মূর্তির পূজা করত। এ মর্মে কুরআনে এসেছে

﴿وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمۡ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّٗا وَلَا سُوَاعٗا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسۡرٗا ٢٣﴾ [نوح: ٢٣]

“তারা বলল, তোমরা ছাড়বে না তোমাদের উপাস্যদের এবং তোমরা ওয়াদ , সূওয়া, ইয়াগুছ, ইয়া‘উক ও নসরের উপাসনা পরিত্যাগ করবে না। ” আল-কুরআন, সূরা নূহ : ২৩।

ওয়াদ ছিল ‘কালব’ গোত্রের দেবতা, ‘সুওয়া’ ‘হুযাইল’ গোত্রের, ‘ইয়াগুছ’ ‘মায্যাহ’ গোত্রের, ‘ইয়া‘উক’ ইয়ামেনের ‘হামদান’ গোত্রের এবং ‘নাসর’ মীনা অঞ্চলের ‘হামীর’ গোত্রের দেবতা ছিল। (ড. জামীল আব্দুল্লাহ আল-মিসরী , *তারিখুদ দা‘ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ ফি জামানির রাসূল ওয়াল খোলাফায়ে রাশেদীন,* (মদীনা মুনওয়ারা : মাকতাবাতুদ দার, ১৯৮৭ খৃ.), পৃ. ৩১।

[17] এ মর্মে পবিত্র কুরআনে এসেছে ﴿أَفَرَءَيۡتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلۡعُزَّىٰ ١٩ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلۡأُخۡرَىٰٓ ٢٠﴾ [النجم: ١٩، ٢٠] “তোমরা কি ভেবে দেখছো ‘লা’ত’ ও ‘ওয্যা’ সম্পর্কে এবং তৃতীয় আরেকটি ‘মানাত’ সম্পর্কে ?” আল-কুরআন, সূরা আন্ নাজম : ১৯-২০।

‘লাত’ ‘মানাত’ ও ‘ওয্যা’ ছিল প্রসিদ্ধ ও প্রধান মূর্তি। এছাড়াও তারা ‘ইসাফ’ ও ‘নায়েলা’ নামক মূর্তিদ্বয়েরও উপাসনা করত।[18] এসব মূর্তির অনুসরণে স্বল্প সময়ের মধ্যে হেজাজের সর্বত্র শির্কের আধিক্য এবং মূর্তি স্থাপনের হিড়িক পড়ে যায়। প্রত্যেক গোত্র পর্যায়ক্রমে মক্কার ঘরে ঘরে মূর্তি স্থাপন করে। পবিত্র কা‘বা গৃহেই ৩৬০ টি দেবতার মূর্তি ছিল। ৩৬০ দিনে হয় এক বছর। তারা

লাত: চারকোণ বিশিষ্ট একটি পাথরের মূর্তি , যার চতুর্পার্শে আরবরা তা’ওয়াফ করতো। এটি তায়েফে স্থাপন করা হয়েছিল। (আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপূরী, *আর রাহীকুল মাখতুম* , অনু: খাদিজা আক্তার রেজায়ী , (ঢাকা: আল-কোরআন একাডেমী লন্ডন , বাংলাদেশ সেন্টার, ৯ম সংস্করণ, ২০০৩), পৃ. ৫১)।

মানাত : কালো পাথরে নির্মিত মূর্তি , যা লোহিত সাগরের উপকূলে কোদাইদ এলাকার মুসাল্লাল নামক জায়গায় স্থাপন করা হয়েছিল। (প্রাগুক্ত)

ওয্যা: ওয্যা ছিল আরাফাতের নিকটবর্তী ‘নাখলা’ নামক স্থানের মূর্তি। কুরাইশদের নিকট এ মূর্তিটি সর্বাধিক সম্মানিত ছিল।

[18] ‘ইসাফ’ ছিল কা ‘বাঘর সংলগ্ন। আর ‘নায়েলা’ ছিল যমযমের কাছে। কুরায়শরা কা‘বা সংলগ্ন মূর্তিটাকেও অপর মূর্তি কাছে সরিয়ে দেয়। এটা ছিল সে জায়গা যেখানে আরবরা কুরবানী করত। (সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, *নবীয়ে রহমত*, অনু: আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী , (ঢাকা ও চট্টগ্রাম : মজলিস নাশইরাত-ই-ইসলাম, ১৯৯৭ খৃ), পৃ. ১১১।

প্রত্যেক দিনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট মা ‘বুদের পূজা করত।[19] মক্কার অলিতে-গলিতে মূর্তি ফেরী করে বিক্রি করা হত। দেহাতী লোকেরা এটা পছন্দ করত , খরিদ করত এবং এর দ্বারা আপন ঘরের সৌন্দর্য্য বর্ধন করত।[20] এছাড়াও পৌত্তলিকরা বিভিন্নভাবে উল্লেখিত মূর্তির উপাসনা করত। যেমন,

ক. তারা মূর্তির সামনে নিবেদিত চিত্তে বসে থাকত এবং তাদের কাছে আশ্রয় পার্থনা করত। তাদেরকে জোরে জোরে ডাকত এবং প্রয়োজনপূরণ, মুশকিল আসান বা সমস্যার সমাধানের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করত|

খ. মূর্তিগুলোর উদ্দেশ্যে হজ্ব ও তওয়াফ করতো | তাদের সামনে অনুনয় বিনয় এবং সিজদায় উপনীত হতো।

গ. মূর্তির নামে নযর-নেওয়ায ও কুরবানী করত। এমর্মে কুরআনে এসেছে, “তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে সেসব জন্তু যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়।”[21]

---

[19] তাহের সূরাটী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৫।

[20] সাইয়্যেদ আবুল হাসান নদভী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১।

[21] আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা : ৩।

ঘ. মূর্তির সন্তুষ্টি লাভের জন্য পানাহারের জিনিস, উৎপাদিত ফসল এবং চতুষ্পদ জন্তুর একাংশ মূর্তির জন্য তারা পৃথক করে রাখতো। পাশাপাশি আল্লাহর জন্যেও একটা অংশ রাখতো। পরে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহর জন্য রাখা অংশ মূর্তির কাছে পেশ করতো। কিন্তু মূর্তির জন্য রাখা অংশ কোন অবস্থায়ই আল্লাহর কাছে পেশ করতো না।[22]

এছাড়াও তারা বিভিন্ন মূর্তির নামে পশু মানত করতো। সর্বপ্রথম মূর্তির নামে পশু ছেড়েছিলেন, ‘আমর ইবন লোহাই।[23] তারা যেসব আচার অনুষ্ঠান পালন করতো এজন্য যে মূর্তি তাদের

---

[22] আল্লাহ বলেন,

﴿وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلۡحَرۡثِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ نَصِيبٗا فَقَالُواْ هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعۡمِهِمۡ وَهَٰذَا لِشُرَكَآئِنَاۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمۡ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمۡۗ سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ ١٣٦﴾ [الانعام: ١٣٦]

“আল্লাহ যেসব শষ্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তারা আল্লাহর জন্যে একাংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা মতে বলে, এটা আল্লাহর জন্যে এবং এটা আমাদের দেবতাদের জন্যে। যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহর কাছে পৌঁছে না। কিন্তু যা আল্লাহর অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌঁছায়। তারা যা মীমাংসা করে তা বড়ই নিকৃষ্ট।” আল-কুরআন, সূরা আল-আন‘আম : ১৩৬।

[23] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৯৯।

আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম করে দেবে এবং আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করবে।[24] তাদের এ আকীদা বিশ্বাসের সত্যায়ন করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, "ওরা আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করে তা তাদের ক্ষতিও করে না, উপকারও করে না। ওরা বলে এগুলো আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশকারী।[25] তারা বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তির ধারণা পোষণ করে পূজা করত। যখন কোন সফরের ইচ্ছা করত, তখন তারা আরোহন করার সময় মূর্তিটি স্পর্শ করত। সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে এটা ছিল তাদের শেষ কাজ এবং ফিরে এসেও ঘরে প্রবেশের পূর্বে এটা ছিল তাদের সর্বপ্রথম কাজ।

নৈতিক ও চারিত্রিক দিক থেকে তাদের অবস্থা খুবই নাজুক ছিল। তাদের মাঝে জুয়া খেলা ও মদপানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়পূজা, ও নাচগানের আসর জমাত অধিক হারে এবং এতে মদপানের ছড়াছড়ি চলত। বহু রকমের অশ্লীলতা, জুলুম-নির্যাতন, অপরের অধিকার হরণ, বে-ইনসাফী ও অবৈধ

---

[24] আল-কুরআন, সূরা ইউনুস : ১৮।

[25] ইবন হিশাম, *সীরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম* ১ম খন্ড, (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯৪ ইং) পৃ. ৬৫।

উপার্জনকে তাদের সমাজে খারাপ চোখে দেখা হত না। [26] মক্কার মূল ও প্রাচীন বাসিন্দা জাফর ইবন আবি তালিব আবিসিনিয়া অধিপতি নাজ্জাসীর সামনে তৎকালীন আরব সমাজের ও জাহিলী কর্মকান্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন ,“ রাজন! আমরা ছিলাম জাহিলিয়াতের ঘোর তমাসায় নিমজ্জিত একটি জাতি। আমরা মূর্তিপূজা করতাম, মৃত জীব ভক্ষন করতাম , সর্বপ্রকার নির্লজ্জ কাজ করতাম, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতাম , প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ করতাম এবং শক্তিশালী ও সবল লোকেরা দুর্বলকে শোষন করতাম।”[27]

উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনায় তাদের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কা ‘বাঘর তাওয়াফের সময় পুরুষেরা উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করতো এবং মহিলারা সব পোষাক খুলে ফেলে ছোট জামা পরিধান করে তাওয়াফ করতো। তাওয়াফের সময় তারা অশ্লিল কবিতা আবৃত্তি করতো। কবিতাটির অনুবাদ নিম্নরূপ:

“লজ্জাস্থানের কিছুটা বা সবটুকু খুলে যাবে আজ।

---

[26] সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০।

[27] ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৩৬।

যেটুকু যাবে দেখা ভাবব না অবৈধ কাজ।”[28]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবকালে সমগ্র পৃথিবীতে নারী জাতির অবস্থা ছিল অতি শোচনীয় ও মর্মান্তিক। আরব সমাজেও নারীর অবস্থা এর ব্যতিক্রম ছিল না। নারী তার দেহের রক্ত দিয়ে মানব বংশধারা অব্যাহত রাখলেও তার সেই অবদানের কোন স্বীকৃতি ছিল না। সে পিতা , ভ্রাতা, স্বামী সকলের দ্বারা নির্যাতিত হত। যুদ্ধবন্দী হলে হাটে-বাজারে দাসীরূপে বিক্রয় হত, চতুস্পদ জন্তুর ন্যায়। আরব সমাজে কন্যা সন্তানের জন্মই ছিল এক অশুভ লক্ষণ, সম্মান হানিকর ও আভিজাত্যে কুঠারাঘাত তুল্য। তাই কন্যার জন্ম গ্রহণের সাথে সাথে তার জন্মদাতা লজ্জা ও অপমানে মুখ লুকিয়ে বেড়াত এবং হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে তাকে জীবন্ত মাটি চাপা দিতেও কুণ্ঠাবোধ করত না। পবিত্র কুরআনে এ চিত্র খুব সুন্দর ভাবে বিধৃত হয়েছে।

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلۡأُنثَىٰ ظَلَّ وَجۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗا وَهُوَ كَظِيمٞ ۝٥٨ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓۚ أَيُمۡسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمۡ يَدُسُّهُۥ فِي ٱلتُّرَابِۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ ۝٥٩ ﴾ [النحل: ٥٨، ٥٩]

---

28 আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপূরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

“যখন তাদের কাউকেও কন্যার সুসংবাদ প্রদান করা হয় , তখন তাদের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে যায় এবং হৃদয় দগ্ধ হতে থাকে। যে বস্তুর সুসংবাদ তাকে দেয়া হয়েছিল তার লজ্জায় সে নিজেকে কওম থেকে লুকিয়ে চলে এবং মনে মনে চিন্তা করে যে, ওকে কি অপমানের সাথে গ্রহণ করবে না কি তাকে মাটির মধ্যে পুতে রাখবে?”[29]

তৎকালীন সময়ে অগণিত নিষ্পাপ শিশুর বিলাপ আরবের মরুবক্ষে মিশে আছে তার হিসেব কে দেবে?

এ ধরনের কত যে ঘৃণ্য ও জঘন্য প্রথা তাদের মধ্যে বিরাজমান ছিল তার কোন হিসেব নেই। পবিত্র কুরআনে সে দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা ‘আলা বলেন, “যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল ?”[30]

---

[29] আল-কুরআন, সূরা আন্ নাহল : ৫৮-৫৯।

[30] পবিত্র কুরআনে এসেছে,

﴿ وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُئِلَتۡ ۝٨ بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ ۝٩ ﴾ [التكوير: ٨، ٩]

আল-কুরআন, সূরা আত্ তাকভীর : ৮-৯।

বিবাহের সময় তাদের মাতামতের কোন গুরুত্বই ছিল না। একজন পুরুষ অসংখ্য নারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারত।[31] একইভাবে তালাকের ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। পুরুষরা যখনই ইচ্ছা করত যতবার ইচ্ছা তালাক দিত এবং ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তালাক প্রত্যাহার করত।[32]

---

[31] এ মর্মে হাদীসে এসেছে,

قال ابن عميرة الأسدي ، أسلمت وعندي ثمان نسوة قال فذكر ه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اختر منهن أربعة»

"ইবন উমায়রা আল-আসাদী (রা.) বলেন , আমি ইসলাম গ্রহণ করার সময় আমার আটজন স্ত্রী ছিল। বিষয়টি আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানালাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন , তাদের মধ্য থেকে চারজনকে বেছে নাও।"

(আবু দাউদ , *প্রাগুক্ত,* কিতাবুত তালাক, বাবু ফি মান আসলামা ওয়া ইনদাহু নিছায়ান আকছারা মিন আরবা 'আও উখতানে, হাদীস নং- ২২৪১)।

[32] হাদীসে বর্ণিত আছে,

«إن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها و إن طلقها ثلاثاً»

"কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তালাক প্রদানের পর তা প্রত্যাহার করার অধিকারী হতো, যদিও সে তাকে তিন তালাক দিত। "(আবু দাউদ, *প্রাগুক্ত,* বাবু ফী নাসখিল মুরাজাআ বা'দাত তাতলীকাতিছ ছালাছ, হাদীস নং- ২১৯৫)

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী নিজ স্বামীর ওয়ারি শদের উত্তরাধিকারী সম্পত্তিতে পরিণত হত। তাদের কাউকে কেউ ইচ্ছা করলে বিবাহ করত আথবা অপরের নিকট বিবাহ দিত অথবা আদৌ বিবাহ না দেওয়ার ব্যাপারেও তাদের ইখতিয়ার ছিল, যাতে স্বামী প্রদত্ত তার সম্পদ অপরের হস্তগত হতে না পারে।[33]

---

[33] সহীহ বুখারীতে এসেছে,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ ١٩ ﴾ [النساء: ١٩] ، قال عن ابن عباس كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق لامرأته إن شاء بعضهم بزوجها و إن شاءوا لم يزوجها و هم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك.

"ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত , আল্লাহর বাণী "হে ঈমানদার লোক সকল! নারীদেরকে জবরদস্তিমূলক ভাবে উত্তরাধিকার গণ্য করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা হতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখ না।" সূরা আন্ নিসা : ১৯

ইবন আ ব্বাস (রা.) বলেন, কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার ওয়ারিসগণ তার স্ত্রীর উপর কর্তৃত্বশীল হতো। কেউ ইচ্ছা করলে তাকে বিবাহ করত অথবা অন্যত্রে বিবাহ দিত অথবা বিবাহ না দিয়ে আটকিয়ে রাখত। তার পরিবারের লোকজনের তুলনায় তারা হতো তার উপর কর্তৃত্বশীল। এ সম্পর্কে উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, *প্রাগুক্ত,* তাফসীর সূরা আন্ নিসা, বাবু লা ইয়াহিল্লু লাকুম আন তারিছান নিসাআ কারহান, হাদীস নং- ৪৫৭৯)।

মৃতের সম্পদে নারীর কোন উত্তরাধিকারী স্বত্ব স্বীকৃত ছিল না।[34] এমনিভাবে জাহেলী যুগে আরব সমাজে নারী ছিল অবহেলিত, লাঞ্চিত ও অধিকার বঞ্চিত। মূলত তাদের দীনী অনুভূতি তথা দীনে ইবরাহীমের থেকে দূরে সরে যাওয়ার কার ণেই এ ধরনের ঘৃণ্য ও জঘণ্য কাজ আঞ্জাম দিতে সক্ষম ছিল।

এছাড়াও জাজিরাতুল আরবের বিভিন্ন এলাকায় ইয়াহূদী, খৃষ্টান মাজুসিয়াত বা অগ্নিপূজক এবং সাবেয়ী মতবাদের ব্যাপক প্রচলন ছিল। দীনের ব্যপারে ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা বাড়াবাড়ি করত। ইয়াহূদীরা ওযাইর আলাইহিস সালাম ও খৃষ্টানরা ঈসা আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করে। তাই তাদের ঈমান আনয়নের দাবী নিরর্থক। তারা পন্ডিত ও পুরোহিতদেরকে তাদের

---

[34] হাদিসে এসেছে: একদা ছাবিত ইবন কায়েস (রা.) এর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন,ছাবিত উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন তাঁর দুটি কন্যা সন্তান রয়েছে। কিন্তু ছাবিতের ভাই তার সমস্ত পরিত্যাক্ত সম্পত্তি দখল রে নিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মীরাসের আয়াত অবতীর্ণ হয়। (দ্র. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত ফারাইদ, বাবু মা জা'আ ফী মীরাছিস সুলব হাদীস নং-২৮৯১, ইমাম তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, ফারাইদ, বাবু মাজআ ফী মীরাযিল বনাত, হাদীস নং ২০৯২;অবশ্য তিরমিযীতে ছাবিতের স্থলে সাদ ইবনুর রবী (রা.)-এর উল্লেখ আছে)।

পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে এবং মরিয়মের পুত্রকেও। ফলে তারাও সমকালীন আরবে অন্যান্যদের ন্যায় শির্কে নিমজ্জিত ছিল। ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা আসার পরও তারা মতবিরোধ করত। তাদের চরিত্র নিরূপণ করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿ وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ لَيۡسَتِ ٱلنَّصَٰرَىٰ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَقَالَتِ ٱلنَّصَٰرَىٰ لَيۡسَتِ ٱلۡيَهُودُ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَهُمۡ يَتۡلُونَ ٱلۡكِتَٰبَۗ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ مِثۡلَ قَوۡلِهِمۡۚ فَٱللَّهُ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ ١١٣ ﴾ [البقرة: ١١٣]

“ইয়াহূদীরা বলে , খৃষ্টানরা কোন ভিত্তির উপরেই নয় , আবার খৃষ্টানরা বলে ইয়াহূদীরা কোন ভিত্তির উপরেই নয় , অথচ তারা কিতাব পাঠ করে। এমনিভাবে যারা মূর্খ তারাও ওদের মতই উক্তি করে। অতএব, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা দিবেন। যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করেছিল।”[35]

তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের পদাংকের অন্ধ অনুসারী ছিল। যখন তাদের নিকট হেদায়েত বাণী আসত তখন তারা বলত ইতোপূর্বে

[35]আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা : ১১৩।

আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পথ অনুসরণ করে চলেছি , এখনও তাদের অনুসরণ করে যাব। এ মর্মে আল্লাহ তা 'আলা বলেন,

﴿ أَمۡ ءَاتَيۡنَٰهُمۡ كِتَٰبٗا مِّن قَبۡلِهِۦ فَهُم بِهِۦ مُسۡتَمۡسِكُونَ ٢١ بَلۡ قَالُوٓاْ إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّهۡتَدُونَ ٢٢ ﴾ [الزخرف: ٢١، ٢٢]

"আমি কি তাদেরকে কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব দিয়েছি , যার ফলে তারা তাকে আকড়ে রেখেছে ? বরং তারা বলে , আমরা আমাদের পূর্বপূরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে পথপ্রাপ্ত।"[36]

মক্কার পৌত্তলিকরা ভাগ্য পরীক্ষার জন্য 'আযলাম'[37] বা ফাল-এর তীর ব্যবহার করত। এ কাজের জন্য তাদের সাতটি তীর ছিল। তন্মধ্যে একটিতে نعم (হ্যাঁ) অপরটিতে لا (না) এবং অন্যগুলোতে অন্য শব্দ লিখিত ছিল। এ তীরগুলো কাবাগৃহের খাদেমের কাছে থাকত। কেউ নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইলে অথবা কোন কাজ

[36] আল-কুরআন, সূরা যুখরুফ : ২১-২২।

[37] أزلام শব্দটি زلم এর বহুবচন। 'যালাম' এমন তীরকে বলা হয়, যে তীরে পালক লাগানো থাকে না।

করার পূর্বে তা উপকারী হবে না অপকারী, তা জানতে চাইলে সে কা'বার খাদেমের কাছে পৌঁছে একশত মুদ্রা উপঢৌকন দিত। অতঃপর খাদেম তীর বের করে আনতেন , যদি তাতে হ্যাঁ লেখা থাকে তবে কাজটিকে উপকারী মনে করা হত। অন্যথায় তারা বুঝে নিত যে. কাজটি করা ঠিক হবে না।[38]

শুধু এ সকল কুসংস্কারে বিশ্বাস করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি বরং রিসালাত ও আখিরাতকেও তারা অস্বীকার করত। তাদের ধারণা ছিল যে, পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন , কালের প্রবাহেই মৃত্যু হয়।[39] আর কোন মানব রাসূল হতে পারে না , এ ধারণা তাদেরকে রিসালাতে অবিশ্বাসী করার জন্য প্ররোচিত করত।[40]

৩. হানীফ সম্প্রদায়

---

[38] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৮।

[39] ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنۡيَا نَمُوتُ وَنَحۡيَا وَمَا يُهۡلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهۡرُۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنۡ عِلۡمٍۖ إِنۡ هُمۡ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾ ﴾ [الجاثية: ٢٤] আল-কুরআন, সূরা জাসিয়া : ২৪।

[40] ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤۡمِنُوٓاْ إِذۡ جَآءَهُمُ ٱلۡهُدَىٰٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرٗا رَّسُولٗا ﴿٩٤﴾ ﴾ [الاسراء: ٩٤] আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল : ৯৪।

আরবের লোকেরা 'আরাফাত' এর ময়দান, মুসলিম মিল্লাতের নেতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর প্রিয়তম স্ত্রী হাজেরা ও তার পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর স্মৃতি বিজড়িত সাফা মারওয়া পর্বতদ্বয় , যমযমকুপ এবং পবিত্র কা 'বাগৃহ অবস্থিত হওয়ায় এ স্থানের জনগণ পূর্ব হতেই ধর্মীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত ছিল। তবে দীর্ঘদিন এ অঞ্চলে নবী ও রাসূলের আগমন না হওয়ায় অধিকাংশের মধ্যে একেশ্বরবাদের পরিবর্তে বহু ইশ্বরের পূজা তথা শির্ক এবং নানা প্রকার কুসংস্কার প্রবেশ করে। সেখানে বসবাসরত ইয়াহূদী [41], খৃষ্টান[42] এবং সাবেয়ীগণ [43] ছাড়াও কিছু সংখ্যক লোক শুধু এক আল্লাহর ইবাদাত করতো।

---

[41] বলা হয়ে থাকে যে, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর চতুর্থ পুত্র ইয়াহুদার নামে এ ধর্মের নামকরণ করা হয় ইয়াহূদী । এরা পুরোহিত ও পন্ডিতগণের ধ্যান-ধারণা ও ঝোক প্রবণতা অনুযায়ী আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করতো এবং ধর্মীয় রীতিনীতির কাঠামো তৈরী করতো। তাদের অঘোষিত ধর্মীয় গ্রন্থের নাম হচ্ছে 'তালমূদ'। (মাযহার উদ্দিন সিদ্দিকী, *ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম,* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খৃ. ১৯৯১), পৃ. ৫২-৫৩ ; সাইয়্যেদ আবুল হাসান আন নদভী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪০) সত্যিকার অর্থে মূসা আলাইহিস সালাম ছিলেন তাদের জন্য প্রেরিত রাসূল। তারা ছিল মারাত্মক কুচক্রী ও প্রতারক। তাদের চরিত্র ও নৈতিকতা বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে,

সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ঘোর তমাসাচ্ছন্ন সমাজে এমন কতিপয় লোকের বসবাস ছিল যাদেরকে জাহেলিয়াতের রুসম-রেওয়াজ , মূর্তিপূজা, শির্ক প্রভৃতির কোন কিছুই স্পর্শ করতে পারে নি। তারা দীনে ইবরাহীমের উপর অটল ও অবিচল ছিল। পবিত্র কুরআনে এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে "নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং

﴿ ۞يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ ﴾ [التوبة: ٣٤]

আল-কুরআন, সূরা আত্ তাওবা : ৩৪ এ ছাড়াও আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেমন : ২:১১৩, ১২০; ৩: ৬; ৫: ২০, ৫৪, ৬৭, ৮৫; ৯ : ৩০। (মুহাম্মদ ইবন আব্দুল করিম ইবন আবু বকর আহমদ আল-শাহরাস্তানী, *আল-মিনাল ওয়াল নিহাল*, ১ম খন্ড, (মিসর : মাকতাবা মুস্তফা আল-বাবী আল হালবী ওয়া আওলাদুহু খৃ.১৯৯৭), পৃ. ২০৯।

[42] খৃষ্টানরা নিজেদেরকে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর অনুসারী বলে দাবী করে থাকে। আল্লাহ রাববুল আলামীন তাঁর নিকট ইঞ্জীল কিতাব অবতীর্ণ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে তারা এ কিতাবে বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন , পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়েজনের মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ব হেদায়েতের বিকৃতি ঘটায়। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন: আল-কুরআন, সূরা আস-সফ : ১৪; আল-বাকারা : ৬২।

[43] নক্ষত্র ও ফেরেশ্‌তাপূজক। এরা নিজেদের পছন্দমত বিভিন্ন ধর্ম থেকে কিছু কিছু গ্রহণ করেছিল। ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮।

যারা ইয়াহূদী, নাসারা এবং সাবেঈন (তাদের মধ্য থেকে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রাতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে, তার সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে। আর তাদের কোনই ভয়-ভীতি নেই, তারা দূঃখিতও হবে না।"[44]

উপরোক্ত আয়াতে কারীমার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দা'ওয়াতের পূর্বেও আরবে একদল ঈমানদারের অস্তিত্ব বিদ্যামান ছিল। আর তাদেরকেই বলা হয় 'হানাফী সম্প্রদায়'।[45] তারা বিভিন্ন গোত্রের মধ্য হতে বিভিন্ন মতের অধিকারী ছিল। ফলে তাদের মাঝে কোন ঐক্য ছিল না। হানীফ সম্প্রদায় আল্লাহর একত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল বটে, কিন্তু তাদের এ ধ্যান-ধারণা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে নি। তবে মূর্তিপূজা ও শির্ক নির্মূলে তারা ঐক্যবদ্ধ ছিল। তাদের মধ্যে

[44] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَٰخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٢ ﴾ [البقرة: ٦٢] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা : ৬২।

[45] হানীফ অর্থ একনিষ্ঠ। আল-কুরআনে কা'বা নির্মাতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কে হানীফ হিসেবে উল্লেখ করেছে। আল-কুরআন, সূরা আল- বাকারা : ১২৪।

উমাইয়া ইবন আবি স সালত, ইবন আওফ আল-কিনানী , হাশিম ইবন আবদ্ আল-মান্নাফ , ওরাকা বিন্ নওফল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[46] অতএব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা সত্যের দা'ওয়াত গ্রহণ করার জন্য স্বল্প সংখ্যক হলেও একনিষ্ঠ তাওহীদপন্থী লোকের অস্তিত্ব সমকালীন আরবে বিদ্যমান রেখেছিলেন। পি.কে হিট্টি বলেন যে , ধর্ম বিষয়ে আরবের সাধারণ অবস্থা একটা পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল বলে মনে হয় এবং একজন সমাজ সংস্কারক ও জাতীয় নেতা আবির্ভাবের জন্য মঞ্চ তৈরী হচ্ছিল।[47]

তৎকালীন আরবের রাজনৈতিক অবস্থা খুবই নাজুক ও অস্থিতিশীল ছিল। জোর যার মুল্লুক তার এ নীতি সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল। সামান্য ও তুচ্ছ বিষয়ে তাদের মাঝে বিরোধ দেখা দিত। প্রতিশোধ প্রবণতা ছিল তাদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তারা অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করতে উদ্যত হত। কোন হত্যাকান্ড

---

[46] মুহাম্মদ ইদ্রীস কানদেহলভী , *সীরাতুল মোস্তফা*, (দেওবন্দ : ইরশাদ বুক ডিপো, তা.বি.), পৃ. ১৩৯।

[47] P.K Hitti, opcit, P.87.

সংগঠিত হলে তার প্রতিশোধ অন্যায়ভাবে আরেকটি হত্যাকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে নিত। ফলে ন্যায়-অন্যায় এর মাঝে বিচার-বিশ্লেষনের কোন তোয়াক্কা করত না। সমাজের মানুষ দাস ও প্রভু এ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রভুরা অর্থসম্পদ কেবল নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ, আরাম-আয়েশ, ঐশ্বর্য ও বিলাসিতায় ব্যয় করতো। আর দাসরা অনাহারে জীবন-যাপন করত। প্রভুরা দাসদের উপর সকল প্রকার জুলুম-অত্যাচার চালিয়ে যেত , দাসরা সেসব মুখ বুঁজে নির্বিচারে সহ্য করতো। কোন প্রকার অভিযোগ করার তাদের উপায় ছিল না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের সময়ে আরবদের সমাজিক কাঠামো বিপর্যস্ত ও ধ্বংসের মূখোমুখি ছিল। তারা এক উপদ্বীপে বাস করলেও তাদের মাঝে সামাজিক রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল না। বরং সেটি বিভিন্ন গোত্রের গোত্রপতি কর্তৃক শাসিত বহুরূপী রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। বিভিন্ন গোত্র ও জাতির মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ সবসময় লেগেই থাকত। তৎকালীন সময় রোম এবং পারস্য সামাজ্য ছিল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের সময় এ

দু’শক্তির মাঝে যুদ্ধ চলছিল। পবিত্র কুরআনে তাদের যুদ্ধের চিত্র তুলে ধরেছে এভাবে,

﴿الٓمٓ ۝١ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۝٢ فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ ۝٣﴾ [الروم: ١، ٣]

“আলিফ, লাম, মীম। রোমকরা পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিসত্বর বিজয়ী হবে।[48]

তারা ছিল অত্যন্ত কলহকারী ও বিশৃংখল জাতি।[49] খুব ছোট-খাট বিষয়ে তাদের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ লেগে যেত এবং পরবর্তীতে তা যুদ্ধে পরিণত হতো। এক উষ্ট্রী হত্যাকে কেন্দ্র করে তাদের মাঝে প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ যুদ্ধ চলছিল। ইতিহাসে এটি ‘হারবুল

---

[48] আল-কুরআন, সূরা আর রূম : ১-৩ ।

[49] আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِنَّمَا يَسَّرۡنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلۡمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوۡمٗا لُّدّٗا ۝٩٧﴾ [مريم: ٩٧]

“আমি কুরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দেন এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন।” আল-কুরআন, সূরা মরিয়ম : ৯৮।

বাসূস’ নামে সমধিক পরিচিত।[50] তাদের সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا ﴿١٠٣﴾ ﴾ [ال عمران: ١٠٣]

‘তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু ছিলে , অতঃপর আমি তোমাদের অন্তরে বন্ধুত্বের ভাব সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম। ফলে তোমরা পরস্পরে ভাই-ভাই হয়ে গেলে।”[51] তাদের মাঝে জাহেলী প্রতিশোধ স্পৃহা, ক্রোধ, গোত্রপ্রীতি চরমভাবে বিদ্যমান ছিল।

ইয়াহূদী ধর্মের অনুসারীদের ছিল আকাশ ছোঁয়া অহংকার। ইয়াহূদী পুরোহিতরা আল্লাহ তা ‘আলাকে বাদ দিয়ে নিজেরাই প্রভু হয়ে বসেছিল। তারা মানুষের উপর নিজেদের ইচ্ছা জোর করে চাপিয়ে দিত। তারা মানুষের চিন্তা-ভাবনা , ধ্যাণ-ধারণা এবং মুখের কথা নিজেদের মর্জির অধীন করে দিয়েছিল। ধর্ম নষ্ট করে হলেও তারা ক্ষমতা ও ধন-সম্পদ পেতে চাইত। অপরদিকে খৃষ্ট ধর্ম ছিল এক

---

[50] ইবনুল আছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯২-২৯৫।

[51] আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান : ১০৩।

উদ্ভট মূর্তিপূজার ধর্ম। তারা আল্লাহ তা 'আলা এবং মানুষকে বিস্ময়করভাবে একাকার করে দিয়েছিল। আরবের যে সব লোক এ ধর্মের অনুসারী ছিল , তাদের উপর এ ধর্মের প্রকৃত কোন প্রভাব ছিল না। কেননা দীনের শিক্ষার সাথে তাদের ব্যক্তি জীবনের কোন মিল ছিল না। কোন অবস্থায়ই তারা নিজেদের ভোগ সর্বস্ব জীবন-যাপন পরিত্যাগ করতে রাজি ছিল না। পাপের পথে নিমজ্জিত ছিল তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন। আরবের অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের জীবনও ছিল পৌত্তলিকদের মতো। কেননা তাদের ধর্মের মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও মনের দিক থেকে তারা ছিল একই রকম। তাদের পারস্পরিক জীবনাচার এবং রুসম-রেওয়াজের ক্ষেত্রও এক ও অভিন্ন ছিল।[52]

[52] আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের উদ্দেশ্য

মানুষ আশরাফুল মাখলূকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। ফেরেশ্‌তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে তিনি মানুষকে খলীফা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।[53] যাতে মানবজাতি তাঁর প্রশংসা , গুণগান, নি‘আমতরাজির কৃতজ্ঞতা ও ইবাদত-বন্দেগীতে রত থেকে জীবন অতিবাহিত করে। আর এ সকল কার্যাবলী কোন পন্থায় ও কি পদ্ধতিতে পালন করবে সে মর্মে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ হয়েছে। মানব জাতির আদি পুরুষ আদম আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টির মাধ্যমেই এ পৃথিবীতে মানুষের পদচারণা শুরু হয়। তিনি শুধুমাত্র একজন মানবই ছিলেন না বরং তাঁকে নবী হিসেবে এ দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে।[54] পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর বাহ্যিক পরিচয় ও লক্ষণ এবং

---

[53] ﴿ وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٠ ﴾ [البقرة: ٣٠]-কুরআন, সূরাআল-বাকারা : ৩০।

[54] নবী হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে কুরআনুল কারীমে আদম আলাইহিস সালাম-এর উল্লেখ না থাকলেও পরোক্ষভাবে উল্লেখ আছে। যেমন :

﴿۞إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحٗا وَءَالَ إِبۡرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمۡرَٰنَ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ٣٣﴾ [آل عمران: ٣٣] আল-কুরআন, সূরা আন নিসা : ৩৩ ; সূরা ত্বা-হা: ১২০-১২১। তবে রাসূলের হাদীসে তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় নবী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল,

أَنَبِيٌّ كَانَ آدَمُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مُكَلَّمٌ»

আদম কি নবী ছিলেন? জবাবে তিনি বলেন, "হ্যাঁ, তাঁর সাথে (আল্লাহর) কথাও হয়েছে।" [সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৬১৯০ (সম্পাদক)]

নবী শব্দটি একবচন , বহুবচনে الأنبياء। যা আরবী نبا ধাতু হতে নির্গত। যার অর্থ হলো সংবাদ। নবীগণ যেহেতু আল্লাহর পক্ষ হতে সংবাদ বাহকের দায়িত্ব পালন করেন এ জন্য তাদেরকে নবী বলা হয়। মানুষের মধ্য হতে যাদের মর্যাদাকে সুউচ্চ ও সম্মানিত করার নিমিত্তে আল্লাহ ওহী দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান প্রদানের জন্যে নির্বাচিত করেছেন তাঁরাই নবী। (আবু বকর যাবের, *আকীদাতুল মু'মিন,* (জিদ্দা : দারুশ শূরুক, ৫ম সংস্করণ-১৯৮৭), পৃ. ২৬৯। কারো কারো মতে, নবী শব্দটি 'নাবয়াতুন' হতে নির্গত। অর্থ উন্নত ও উচ্চ মর্যাদাবান বস্তু । নবী সাধারণ মানুষের তুলনায় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এ হিসেবে তাকে নবী বলা হয়। আন -নাবীয়্যুন শব্দের অর্থ সরল ও স্পষ্ট পথও হতে পারে। নবীগণ নিজেরা সরল ও স্পষ্ট পথে চলেন এবং মানুষকে সে পথে আহবান করেন , তাই তাদের নবী বলা হয়। (ইবন মানযূর , *লিসানুল আরব,* ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪)

সেগুলোর বৈশিষ্ট্যাবলী মহান আল্লাহ তাঁকে ব্যাপকভাবে শিক্ষা দিয়েছেন,[55] যেন তিনি এ সমুদয় বস্তুর পরিচিতি লাভের মাধ্যমে আল্লাহর নির্ধারিত পথে নিজকে পরিচালিত করতে পারেন এবং তাঁর সন্তানাদিও সে পথের অনুগামী হতে পারে। অতএব , জীবন চলার সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য পৃথিবীতে নবী-রাসূলগণের আগমন হয়েছে। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত পৃথিবীর এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাদের নিকট সতর্ককারী প্রেরণ করা হয় নি।[56] আর এ সতর্ককারী হলেন নবী বা নবুয়তের আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ।[57] মানব জাতিকে স্রষ্টার

---

[55] কুরআনের বাণী : ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَى ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِي بِأَسۡمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٣١ ﴾ [البقرة: ٣١]
"আর তিনি আদম আলাইহিস সালাম-কে যাবতীয় বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। অতঃপর সে সমুদয় ফেরেশ্‌তাদের সামনে প্রকাশ করলেন এবং বললেন , এ সকল নাম আমাকে বলে দাও , যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা : ৩১।

[56] ﴿ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗاۚ وَإِن مِّنۡ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٞ ٢٤ ﴾ [فاطر: ٢٤]
"এমন কোন সম্প্রদায় নেই , যার নিকট সতর্ককারী প্রেরণ করা হয়নি।" আল-কুরআন, সূরা ফাতির : ২৪।

[57] জালালূদ্দীন সূয়ূতী ও মাহাল্লী , *তাফসীরে জালালাইন*, (চীন: পিকিং প্রেস , ১৯৮২খৃ. ১৪০২ হি.), পৃ. ৫৭৭।

পক্ষ থেকে সতর্ককারী ও পথপ্রদর্শকরূপে আগমনকারী মহামানবগণকে কুরআনুল কারীমে নবী ও রাসূল রূপে অভিহিত করা হয়েছে। মানুষ ও ফেরেশ্‌তা এ দু'শ্রেণীর মধ্য হতেই আল্লাহ তাদের মনোনীত করেন।[58]

আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিকে তাঁর ইবাদত-বন্দেগী ও গুণা গুণ বর্ণনা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন।[59] কিন্তু এ ইবাদত কোন পদ্ধতিতে কি রূপে করতে হবে তা সম্পর্কে মানুষ জ্ঞাত নয়। ফলে তিনি নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন, যাতে মানুষ যথাযথভাবে তা সম্পন্ন করতে পারে। আর এটি হল সৃষ্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

---

[58] এ মর্মে পবিত্র কুরআনে এসেছে,

﴿ ٱللَّهُ يَصۡطَفِي مِنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلٗا وَمِنَ ٱلنَّاسِۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٞ ۝٧٥ ﴾ [الحج: ٧٥]

'আল্লাহ ফেরেশ্‌তাদের মধ্য হতে মনোনীত করে বাণী বাহক এবং মানুষর মধ্য হতেও ; আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সম্যকদ্রষ্টা।" আল-কুরআন, সূরা হজ্জ : ৭৪।

[59] এ মর্মে তিনি বলেন,

﴿ وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ۝٥٦ ﴾ [الذاريات: ٥٦]

"আমি মানুষ এবং জ্বিন জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" আল-কুরআন, সূরা আয্‌ যারিয়াত : ৫৬।

মানুষের দু ’টি জীবন রয়েছে । একটি ইহলৌকিক অপরটি পরলৌকিক। এ উভয় জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা কিসের উপর নির্ভরশীল তা নির্ণয় করার জন্য এবং মানব জাতিকে সঠিক পথের দিশা দিতে নবী -রাসূলগণের আগমন একান্ত অপরিহার্য ছিল।

নবী-রাসূলগণের প্রেরণের উদ্দেশ্য

মহান আল্লাহ তা ‘আলা এ পৃথিবীর লালনকর্তা , পালনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা। তিনি সমুদয় বস্তুর মালিক ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর এ সকল গুণাবলী ও মহাপরাক্রম ক্ষমতা নবুওয়ত ও রিসালাতের প্রয়োজনীয়তাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে দিয়েছে। কেননা , এ সকল বিষয়ে মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত, অথচ আল্লাহ তা ‘আলা অসীম। তাঁর এ অসীম ও পরাক্রমশালী যাবতীয় গুণাবলীর পরিচয় সম্পর্কে নবী-রাসূলগণ অবগত ছিলেন। তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীলব্ধ জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে সমুদয় বিষয়ে মানুষকে হেদায়াত দিয়েছেন। মানুষকে আল্লাহর রুবুবিয়্যাত সম্পর্কে পরিচয় লাভ করা ও সঠিক পথের দিশা দিয়ে পার্থিব ও পরকালীন জীবনের কল্যাণ ও

সৌভাগ্যলাভের পথ সম্পর্কে জ্ঞান দানের জন্য রাসূলগণের আগমন হয়েছে।[60] আল্লাহ তা ‘আলা নবী-রাসূল প্রেরণের পটভূমি ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٢١٣ ﴾ [البقرة: ٢١٣]

“সকল মানুষ একটি জাতি সত্ত্বার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা নবীগণকে পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে। আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব , যাতে মানুষের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুত কিতাবের ব্যপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি। কিন্তু পরিস্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পারিক জেদ বশতঃ তারাই করেছে , যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল। অতঃপর

---

[60]আবু বকর যাবের আল-জাযায়েরী , *মিনহাজুল মুসলিম*, (জিদ্দা: দারূশ শুরুক , ১৯৯০), পৃ. ৫২।

আল্লাহ ঈমানদারদেরকে হেদায়েত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপার তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।”[61]

উপরোক্ত আয়াতগুলোর মর্মার্থ অনুধাবনে বোধগম্য হয় যে , কোন এককালে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একই মতাদর্শ ও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[62] সবাই একই ধরনের বিশ্বাস ও আকীদা পোষণ করত।

---

[61] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা : ২১৩।

[62] মানুষ কখন এক উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন , একই উম্মত বলতে একই ধর্মের অনুসারী বুঝানো হয়েছে। ইবন কা'ব ও ইবন যায়দ (রা.)-এর অভিমত হলো : মানুষ বলতে এখানে আদম সন্তানকে বুঝানো হয়েছে। তাদের ধর্মীয় ঐক্য ছিল সে সময়, যখন আল্লাহ তা 'আলা আদম সন্তা-নদেরকে তাদের পিতা আদম আলাইহিস সালাম-এর পৃষ্টদেশ হতে বের করে তাদের নিকট হতে আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি আদায় করেছিলেন। (ইমাম কুরতুবী , *প্রাগুক্ত*, ৩য় খন্ড, পৃ. ৩০)।

প্রখ্যাত তাফসীরকারক ইবন আব্বাস (রা.) বলেন , আদম আলাইহিস সালাম ও নূহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত যে দশটি যুগ অতিক্রান্ত হয়েছিল সে সময়কার মানুষ সঠিক ধর্মের উপর ছিল। অতঃপর তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে আল্লাহ নূহ আলাইহিস সালাম ও পরবর্তী কালের নবীগণকে প্রেরণ করেন। (মুহাম্মদ আলী আস্-সাবুনী , *আন্ নবুয়্যাত ওয়াল আম্বিয়া* , প্রাগুক্ত, পৃ.৯)।

অতঃপর তাদের মধ্যে আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যাণ-ধারণার বিভিন্নতা দেখা দেয়। ফলে, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ তা 'আলা সত্য ও সঠিক মতবাদকে প্রকাশ করার জন্য এবং সঠিক পথ দেখাবার লক্ষ্যে নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেন এবং তাদের প্রতি আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেন। নবীগণের চেষ্টা , পরিশ্রম ও তাবলীগের ফলে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ও তাদের প্রদর্শিত সত্য-সঠিক পথ ও মতকে গ্রহণ করে নেয় , আর একদল তা প্রত্যাখ্যান করে। প্রথমোক্ত দল নবীগণের অনুসারী এবং মু'মিন বলে পরিচিত, আর শেষোক্ত দলটি নবীগণের অবাধ্য, অবিশ্বাসী এবং কাফের হিসেবে গণ্য।

অতএব বলা যায় যে , আল্লাহ তা'আলা যে অসংখ্য নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব প্রেরণ করেছেন , তার উদ্দেশ্য ছিল "মিল্লাতে ওয়াহদা" ত্যাগ করে যে মানব সমাজ বিভিন্ন দল ও ফেরকাতে বিভক্ত হয়েছে তাদেরকে পূণরায় পূর্ববর্তী ধর্মের আওতায় ফিরিয়ে আনা। নবীগণের আগমনের ধারাটিও এভাবেই চলেছে। যখনই মানুষ সৎপথ থেকে দূরে সরে গেছে , তখনই হেদায়েতের জন্য

আল্লাহ তা'আলা কোন না কোন নবী প্রেরণ করেছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন, যেন তাঁর অনুসরন করা হয়। আবার যখন তারা পথ হারিয়েছে তখন অন্য একজন নবী পাঠিয়েছেন এবং কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এর ধারাবাহিকতায় সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ ধরাধামে আগমন ঘটেছে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন

ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম। প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের সমুদয় সময় ও ক্ষনকে এই দীনের প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তে অতিবাহিত করেছেন। দীন প্রচারের সুমহান দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেছেন। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে এসেছেঃ

﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ٢ ﴾ [الجمعة: ٢]

"তিনি সেই সত্ত্বা যিনি নিরক্ষরদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াত সমূহ পড়ে শুনান ,

তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অথচ ইতোপূর্বে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল।”[63]

সুতরাং আয়াত সমুহের তেলাওয়াত, আত্মার পরিশুদ্ধি, কিতাবুল্লাহ তথা কুরআনের শিক্ষাদান বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা , উন্নত নৈতিকতা ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের গুরুদায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়েছিল। তাঁর আগমনের প্রাক্কালে আরবের লোকেরা ধ্বংসের দ্বার-প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। আল্লাহ তা ‘আলা তাঁর মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস থেকে মুক্তি দিয়েছেন। কেননা আল্লাহর রীতি হলো, কোন জালিম সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পূর্বে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা, যিনি তাদেরকে সত্য ও সঠিক পথের দিকে আহবান করবেন। এ মর্মে সূরা আল-কাসাসে এসেছেঃ

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهۡلِكَ ٱلۡقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبۡعَثَ فِيٓ أُمِّهَا رَسُولٗا يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِنَاۚ وَمَا كُنَّا مُهۡلِكِي ٱلۡقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهۡلُهَا ظَٰلِمُونَ ٥٩﴾ [القصص: ٥٩]

“আপনার পালকর্তা জনপদ সমূহকে ধ্বংস করেন না , যে পর্যন্ত তার কেন্দ্রস্থলে রাসূল প্রেরণ না করেন। যিনি তাদের কাছে

---

63 আল-কুরআন , সূরা আল-জুম‘আ : ২।

আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন তার বাসিন্দারা জুলুম করে।"[64]

অতএব, আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর জ্ঞান মানুষের মাঝে প্রচার করার মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়কে মুক্তির অমীয় সুধা পানের জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আভির্ভুত হয়েছিলেন।

তিনি (মুহাম্মদ সা.) মানবজাতিকে আল্লাহর ভীতিপ্রদর্শন ও জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন , যাতে মানুষেরা অকল্যাণকর ও যাবতীয় অবৈধ পন্থা অবলম্বন থেকে দূরে থাকে।[65] মূলতঃ এ সুসংবাদ ও ভীতিপ্রদর্শক রূপেই আল্লাহ ত 'আলা যুগে যুগে নবী-রাসূলদের এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, যেন মানব জাতি কিয়ামতের দিন এ আপত্তি করতে না পারে যে , হে আল্লাহ ! কিসে তোমার

---

[64] আল-কুরআন্ সুরা আল-কাসাস : ৫৯।

[65] মহান আল্লাহ বলেন

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَـٰكَ شَـٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ۝٤٥ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ وَسِرَاجٗا مُّنِيرٗا ۝٤٦﴾ [الاحزاب: ٤٥، ٤٦]

"হে নবী ! আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে সুসংবাদতা ও ভীতিপ্রদর্শন রূপে এবং আল্লাহর নির্দেশ তার প্রতি আহবানকরী উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। " আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব : ৪৫-৪৬।

সন্তুষ্টি এবং কিসে অসন্তুষ্টি তা আমরা অবগত ছিলাম না। যদি আমরা জানতাম তা হলে সে অনুসারে জীবন পরিচালনা করতাম। এ ধরনের কোন দলীল বা প্রমাণ যেন মানুষ উপস্থাপন করতে না পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আল্লাহ নবী-রাসূলগণের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٦٥ ﴾ [النساء: ١٦٥]

"আমি সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূল আগমনের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"[66]

মু?হাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা বিশ্বের জন্য ভীতিপ্রদর্শনরূপে প্রেরিত হয়েছেন , যেন আহলে কিতাবরা (ইয়াহূদী ও খৃষ্টান) অভিযোগ উত্থাপন করতে না পারে যে ,

[66]আল-কুরআন, সূরা আন্ নিসা : ১৬৫।

আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক আসে নি।[67]

এ মর্মে সূরা ত্বা-হায় এসেছে, মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنَٰهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِۦ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ١٣٤ ﴾ [طه: ١٣٤]

"যদি আমি এদেরকে ইতপূর্বে কোন শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম , তবে এরা বলত : হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন না কেন? তাহলে তো আমরা অপমানিত ও হেয় হওয়ার পূর্বেই আপনার নিদর্শনসমূহ মেনে চলতাম।"[68]

---

[67] আল্লাহর বাণী

﴿ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ١٩ ﴾ [المائدة: ١٩]

"হে আহলে কিতাবগণ ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করেছেন , যিনি রাসূলগণের বিরতির পর তোমাদের কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন , যাতে তোমরা একথা বলতে না পার যে , আমাদের কাছে কোন সুসংবদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক আগমন করেনি। অতএব , তোমাদের কাছে সুসংবাদ দাতা ভীতিপ্রদর্শক এসে গেছে আর তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। " আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা : ১৯।

[68] আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা : ১৩৪।

তাঁর আগমনের পূর্বে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোন ভীতি প্রদর্শক আগমন করেনি। ফলে মানুষের সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করার অনুভূতি পর্যন্ত লোপ পেয়ে যায়। এ জন্যে মহান আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করেন সর্বশেষ ভীতি প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা রূপে। আর এটি ছিল বান্দার প্রতি মা'বুদের রহমত বা করুণাস্বরূপ।[69]

নবুওয়ত লাভের প্রারম্ভে তিনি এ মর্মে আদিষ্ট হয়েছেন এবং সর্বপ্রথম নিজ পরিবার ও নিকটতম আত্মীয়স্বজনকে আল্লাহর আযাবের ভয় প্রদর্শন করেন। তাঁর উপর নাযিলকৃত আসমানী কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কুরআনেও বিষয়টি এমনভাবে ধ্বনিত হয়েছে, যা প্রমান করছে যে , কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যও তাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজেই এ কথার স্বীকৃতি দিয়েছেন এভাবে , "আমার প্রতি এ কুরআন অবতীর্ণ

---

[69] এ মর্মে পবিত্র কুরআনে এসেছে,

﴿ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُۢ بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوۡلَآ أَرۡسَلۡتَ إِلَيۡنَا رَسُولٗا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٤٧ ﴾ [القصص: ٤٧]

আল-কুরআন,সূরা আল-কাসাস : ৪৭।

হয়েছে, যাতে আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এ কুরআন পৌঁছেছে সবাইকে ভীতি প্রদর্শন করি।”[70]

এ পৃথিবীতে মানুষের চলার পথ দু ’টি। একটি হল সরল সঠিক পথ বা সিরাতুল মুস্তাকীম। অপরটি গোমরাহীর পথ। এ দু ’পথের যে কোন পথে মানুষ পরিচালিত হতে পারে। এজন্যে পরকালেও জান্নাত এবং জাহান্নাম এ দু ’ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে। পবিত্র কুরআন গোটা জাতিকে মুমিন এবং কাফির দু ’ শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। মুমিনগণ কিসের ভিত্তিতে জীবন চালাবেন এবং কোনটি তাদের জীবন নির্বাহের পথ , সে বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । তাই তাঁর আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে “ছিরাতুল মোস্তাকীম ”-এর পথ দেখানো। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন , “নিশ্চয় আপনি প্ররিত রাসূলগণের একজন। সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।”[71]

---

[70] আল্লাহ বলেন,

﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَۚ ١٩﴾ [الانعام: ١٩]

আল-কুরআন, সূরা আল-আনআম : ১৯

[71] আল-কুরআন, সূরা ইয়াসিন : ১-২।

তিনি মানব জাতিকে জাহেলিয়াতের যাবতীয় কুসংস্কার আকীদা-বিশ্বাস প্রভৃতির অজ্ঞতা থেকে ঈমানের আলোর দিকে পথ দেখিয়েছেন, তাঁর উপর অবতীর্ণ আল-কুরআনও মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশা দিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ মর্মে পবিত্র কুরআনের সূরা ইবরাহিমে এসেছে,

﴿ الٓرۚ كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ ۝١ ﴾ [ابراهيم: ١]

"আলিফ, লাম, রা। এটি একটি গ্রন্থ। যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন, পরাক্রান্ত ও প্রশংসার যোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে।"[72] অতএব, সব মানুষকে অন্ধকার তথা তাগুতের পথ থেকে বের করে আলোর পথ তথা সরল সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়তের উচ্চ সোপানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর আদর্শ শুধু স্বীয় অনুসারীদের হেদায়েত

---

[72] আল-কুরআন, সূরা ইবরাহিম : ১।

লাভের মাধ্যমই ছিল না বরং তাঁর উম্মতের বিকীরিত হেদায়েত দ্বারা অন্যান্য উম্মতও অন্ধকার হতে আলোর পথের দিশা পেত। তাঁর সত্ত্বাগত আবির্ভাবের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন , "তিনিই উম্মীদের মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন , যে তাদের নিকট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবে। তাদেরকে পবিত্র করবে এবং শিক্ষা দিবে কিতাব ও হিকমত। "[73] অপর আয়াতে তাঁর অনুসারীদের মাধ্যমে আলোর বিকীরণ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

﴿ كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ ﴾ [ال عمران: ١١٠]

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অসৎ কাজে নিষেধ কর।"[74]

---

[73] ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ٢ ﴾ [الجمعة: ٢] আল-কুরআন, সূরা আল-জুম'আ : ২।

[74] আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান : ১১০।

উপরোক্ত আয়াতে কারীমা হতে প্রতীয়মান হয়ে যে , যেমনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবী হিসেবে প্রেরণ তাঁর উম্মতের জন্য যে উদ্দেশ্য হয়েছিল , অনুরূপ তাঁর উম্মতের প্রেরণ ছিল অন্যান্য জাতির প্রতি আলোকবর্তিকারূপে। আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত হতে এটি আরো সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ঃ

﴿لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيۡكُمۡ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۞٧٨﴾ [الحج: ٧٨]

"যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানবজাতির জন্য।"[75]

সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উভয় পর্যায়ের পূর্ণ যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন; আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ দু'পর্যায়ের পূর্ণ যোগ্যতা প্রদান করেছিলেন।[76]

---

[75] আল-কুরআন, সূরা হজ্জ : ৭৮।

[76] শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী , *হুজ্জাতুল্লাতিল বালিগাহ* , ১ম খন্ড , প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে পরিচয় করে দিতে এবং স্রষ্টার ইবাদতের দিকে আহবান জানানো ছিল নবী-রাসূলদের অন্যতম কাজ। আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন না করে একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করার ব্যপারে মহান আল্লাহ বলেন "আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলকে পাঠিয়েছি তাকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছি যে , নিশ্চয় আমি ব্যতীত তাদের কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর।"[77]

কিন্তু কালের বিবর্তনে মানুষ আল্লাহর ইবাদত থেকে বিমূখ হয়ে বিভিন্ন দেব-দেবীর , গাছ, সূর্য, চন্দ্র, তারকা প্রভৃতির ইবাদতে মশগুল হয়ে পড়ে। ফলে আল্লাহ তা 'আলা তাদেরকে তাঁর ইবাদতের দিকে ধাবিত করতে এবং তাগুতকে অস্বীকার করার আহবান বার্তা নিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করেন। সে কারণে কিছু লোক হেদায়েত প্রাপ্ত হল এবং কিছু সংখ্যক লোক গোমরাহীর পথে রয়ে গেল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি

---

77 ﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥ ﴾ [الانبياء: ٢٥] আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া : ২৫।

আহবান জানিয়েছেন এবং এর মাধ্যমেই তাদের একমাত্র সফলতা নিহিত রয়েছে, এ মর্মে ঘোষণা দিয়েছেন।[78]

কোন জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার জন্য যে কাজটি সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করে তা হল , পারস্পারিক জুলুম-নির্যাতন। এর মাধ্যমে মানুষ অন্যায় ও অসত্যের পথে পা বাড়ায়। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমালংঘন করে। শয়তানের পদাংক অনুসরন করে পথভ্রষ্ট হয়। যুগে যুগে এ সব জুলুম-নির্যাতনের ব্যপারে নবী-রাসূলগণের কণ্ঠ ছিল খুবই উচ্চকিত। তারা জুলুম নির্যাতনের বিপরীতে ইনসাফ ও সুবিচার সমাজে কায়েম করেছেন। মানুষের মাঝে যখনই কোন মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল তখনই রাসূলগণ কিতাব এবং মিযান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুবিচার

---

[78] আল্লাহর বাণী

﴿ وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ فَمِنۡهُم مَّنۡ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنۡهُم مَّنۡ حَقَّتۡ عَلَيۡهِ ٱلضَّلَٰلَةُۚ ٣٦ ﴾ [النحل: ٣٦]

"আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এ মর্মে যে , তারা আমার ইবাদত করবে এবং তাগুত থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর তাদের কিছু সংখ্যক হেদায়াত প্রাপ্ত হল এবং কিছু সংখ্যক গোমরাহ হয়ে পড়ল। " আল-কুরআন, সূরা আন-নহল : ৩৬।

কায়েম করে জুলুমের মুলোৎপাটন করেন। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জুলুম নির্যাতনের চরম পর্যায়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং এর বিপরীতে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অগ্রনী ভুমিকা পালন করেন। নবুওয়ত লাভের পূর্বে যুবক বয়সেই তিনি সমাজ হতে যাবতীয় ন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতন ও অসত্যকে দুর করার জন্যে "হিলফূল ফূযুল" নামক সংঘে যোগ দেন। মানুষের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজেও বিচারকের আসনে সমাসীন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ফলে বহু বিবাদ নিরসনে স্বয়ং তাঁর শত্রুরাও তাঁকে বিচারক হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিতাব ও রাষ্ট্রীয় শক্তি এ উভয়টি করতলগত করার মাধ্যমে সমাজে স্থায়ী সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَأَنزَلۡنَا ٱلۡحَدِيدَ فِيهِ بَأۡسٞ شَدِيدٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ ٢٥ ﴾ [الحديد: ٢٥]

"নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যয়নীতি যাতে মানুষ

সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। তাদের প্রতি আমি লৌহ দন্ড (রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ত) দিয়েছি, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের জন্য অনেক কল্যাণ।"[79]

অতএব সমাজ হতে যাবতীয় অন্যায়-অত্যাচার অপনোদন করে সুবিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন হয়েছিল। যখনই তিনি তা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছেন তখন মুমিনগণ তা আকুন্ঠচিত্তে মেনে নিয়েছে।[80]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবে পৃথিবীতে এক অভূতপূর্ব বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। তাঁর নবুওয়ত মানুষের ধ্যান-ধারণা ও আক্বীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা ও সমাজিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন বিশেষ অবদান রেখেছে যা কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে। তাঁর আগমনের সুবাদে জুলুম-অত্যাচারের পরিবর্তে ন্যায় ও সুবিচার , মূর্খতার পরিবর্তে জ্ঞান ও ভব্যতা, অন্যায়-অপরাধের পরিবর্তে আনুগত্য ও ইবাদত, অবাধ্যতা ও দাম্ভিকতার পরিবর্তে বিনয় ও নম্রতা ,

---

[79] আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ : ২৫।

[80] আল-কুরআন, সূরা আন্ নূর : ৫১।

স্বেচ্ছাচারী ও নিপীড়নের পরিবর্তে ধৈর্য এবং কুফর ও শির্কের পরিবর্তে ঈমান ও তাওহীদ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাঁর নবুওয়ত স্নেহ-দয়া, প্রেম-ভালবাসা ও অনুগ্রহ-অনুকম্পার বাণী শুনিয়েছে। তাঁর দা 'ওয়াত মানব সমাজ সৃষ্টি , মানব জীবন ও মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যে অলৌকিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে , তার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। তিনি স্বীয় শিক্ষার বদৌলতে মানবতাকে অধঃপতনের অতল গ হ্বর হতে উদ্ধার করে প্রগতি ও উন্নতির চরম শিখরে সমাসীন করেছেন। তিনি ঈমানের আলো ও জ্যেতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর আবির্ভাবের ফলে মানুষের আত্মা আলো লাভ করেছে এবং শির্ক , কুফর ও ভ্রষ্টতার অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে। তাঁর আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ায় প্রচলিত ও প্রচারিত যাবতীয় মতাদর্শের অসারতা প্রমাণ করে দীনের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দেয়া এবং দীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে মানুষের মাঝে তুলে ধরা। তাই তিনি হেদায়েত ও সত্য দীন সহকারে এ ধরাধামে আগমন করেছেন। এ মর্মে কুরআনে এসেছেঃ

﴿ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ ٩ ﴾ [الصف: ٩]

“তিনি সেই সত্তা (আল্লাহ), যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীন সহ প্রেরণ করেছেন , যাতে অপরাপর সকল দীন ও মতাদর্শের উপর একে (ইসলামকে) বিজয়ী ঘোষণা দেয়া যায়।”[81]

এ বিজয় ছিল বৈষয়িক , আধ্যাত্মিক, জ্ঞানগত এবং বর্ণনাগত। ইসলাম দলীল-প্রমাণ এবং জ্ঞানগত শক্তি ও যুক্তি দ্বারা প্রতিপক্ষকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন জ্ঞান ও দর্শনের উৎস। আকীদা-বিশ্বাস , রীতি-নীতি ও শিষ্টাচার , ইবাদাত, লেন-দেন, বিবাহ-শাদী, রাষ্ট্রনীতি-পারিবারিক প্রশাসন , আম্বিয়া-ই কিরামের জীবনী ও পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস সম্পর্কিত জ্ঞান দান করে মানুষকে ধন্য করেছেন। তাঁর আগমনের সময় সমগ্র বিশ্ব ‘আমল ও আকীদা , ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার ও প্রথা প্রচলনের অন্ধকার গ হ্বরে নিমজ্জিত ছিল। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব সাধারণ মানুষের চিন্তা চেতনায় দাসত্ববোধ চাপিয়ে দিয়েছিল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সকল কুপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেন, আতঙ্ক ও আশংকার পরিবর্তে শান্তি ও নিরাপত্তা , জুলুম-

[81]আল-কুরআন, সূরা আস্ সাফ : ৯ ।

অত্যাচারের পরিবর্তে ন্যায় ও সুবিচার , গোত্র ও শ্রেণী বৈষম্যের পরিবর্তে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সহজ ও সরলপন্থা প্রবর্তন ও প্রচলন করে মানুষের স্কন্ধ হতে ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার দুর্বহ বোঝা অপসারণ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর এ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

﴿ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡۚ ١٥٧ ﴾ [الاعراف: ١٥٧]

“এবং সে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার ও শৃংখল হতে , যা তাদের উপর চেপে বসেছিল।”[82]

তাঁর নবুওয়ত বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন। তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগত ও বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর সমগ্র জীবন ও শিক্ষায় আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি তাঁর স্নেহ , দয়া ও প্রেম-ভালবাসা প্রকটভাবে বিদ্যমান। পূর্বেকার সকল নবী-রাসূল নিজ নিজ সম্প্রদায় নিজ নিজ এলাকা ও কালের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নবুওয়ত ছিল সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে।[83]

---

[82] আল-কুরআন, সূরা আল-আ‘রাফ : ১৫৭।

[83] এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا ٢٨ ﴾ [سبا: ٢٨]

সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম ও বংশ পরিচয়

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের সুপ্রসিদ্ধ মক্কা নগরীতে 'আমুল ফীলের ' (মুতাবেক ৫৭০ খৃষ্টাব্দ) রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার দিন (প্রসিদ্ধ মতানুসারে) ১২ তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। [84] এটি ছিল মানবতার ইতিহাসে সবচেয়ে আলোকজ্জ্বল ও বরকতময় দিন। তাঁর মাতা বলেন "যখন তিনি জন্ম গ্রহণ করেন তখন দেহ থেকে একটি নূর বের হলো , যার

"আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য সুসংবাদ দাতা ও ভীতিপ্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছি।" আল-কুরআন, সূরা সাবা : ২৮।

[84] ইবনে হিশাম, *আস্ সিরাত আন্ নববীয়াহ,* ১ম খন্ড, (কায়রো : দারুল মানার , ১৯৯০), পৃ.১৬৩. এটাই মশহুর বর্ণনা। তবে মিসরের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ মাহমুদ পাশার গবেষণা প্রসুত সিদ্ধান্ত হল: তাঁর জন্ম আসহাবে ফীলের বছর রবিউল আউয়াল মাসের নয় তারিখ মুতাবিক ৫৭১ খৃষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল তারিখে। সাইয়্যেদ সোলায়মান নদভী , সালমান মনসুরপুরীও একই অভিমত ব্যক্ত করেন। (দ্র. মোহাম্মদ সোলায়মান মনসুরপুরী , *রহমাতুল লীল 'আলামীন,* ৩য় খন্ড, (দিল্লী : হানিফ বুক ডিপো , তা.বি), পৃ ৩৯)।

মাধ্যমে শামদেশ উজ্বল হয়ে গেল। [85] কেসরার রাজপ্রাসাদের চৌদ্দটি পিলার ধসে পড়েছিল। অগ্নি উপসাকদের অগ্নিকুন্ড নিভে গিয়েছিল।[86] তিনি তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ বংশ "বনী হাশিম"-এ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী থেকে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "আমি বনী আদমের উত্তম যুগে এবং সর্বোত্তম বংশে প্রেরিত হয়েছি।"[87] আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর বংশধর থেকে কিনানা গোত্রকে নির্বাচন করেন ; কিনানা থেকে কুরাইশকে নির্বাচন করেন ; কুরাইশ থেকে বনী হাশিম কে নির্বাচন করেন এবং বনী হাশিম থেকে আমাকে নির্বাচন করেছেন।[88] তাঁর পিতৃকুলের বংশ পরম্পরা হল : মুহাম্মদ ইবন

---

[85] মোহাম্মদ ইবন আব্দুল ওহাব নজদী , *মোখতাছার সীরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,* (দিল্লী: মাতবা'আ সুন্নত আল-মোহাম্মাদীয়া, ১৩৭৫ হি.), পৃ. ১২ ; মোহাম্মদ ইবন সা'দ, আত্ *তাবকাতুল কুবরা*, ১ম খন্ড, (মাতবা'আ বেরিল, ১৩২২ হি.), পৃ. ৬৩।

[86] মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওহাব নজদী, *প্রাগুক্ত,* পৃ.১২।

[87] ইমাম বুখারী , *প্রাগুক্ত,* ৬ষ্ঠ খন্ড , পৃ. ৫৬৬ ; আল-বায়হাকী, *দালায়েলুন নবুওয়্যাহ* , ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-১৭৫।

[88] মোহাম্মদ ইবন আব্দুল ওহাব নজদী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৫-২৬।

আব্দুল্লাহ ই বন আব্দুল মুত্তালিব ইবন হাশিম ইবন আবদ্ মানাফ ইবন কুসাই ইবন কিলাব ইবন মু ররাহ ইবন কা ‘ব ইবন লুওয়াই ইবন গালিব ইবন ফিহর ইবন মালিক ইবন নাদর ইবন কিনানা ইবন খুযায়মা ইবন মুদারিকা ইবন ইলিয়াছ ইবন মুদার ইবন নাদার ইবন সা‘দ ইবন আদনান।[89]

মাতৃকুলের বংশ পরস্পরা কিলাব ইবন মু ররাতে গিয়ে পিতার বংশ পরস্পরার সাথে মিলিত হয়।[90]

জন্মের পর তাঁর মা তাঁর দাদা আব্দুল মোত্তালেবের কাছে পৌত্রের জন্মের সুসংবাদ দিলেন। তিনি খুব খুশি হলেন এবং সানন্দে তাঁকে কাবাগৃহে নিয়ে আল্লাহর দরবাবে নবজাতকের জন্য দু ’আ করেন এবং শুকরিয়া আদায় করলেন।[91]

---

[89] ইবনুল কাইয়্যুম আল-জাওযিয়া, *যাদুল মা’আদ,* ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

[90] তাঁর মায়ের বংশ পরিচয় হল : আমিনা বিনত্ ওয়াহাব ইবন যুহরা । (ইবন হাজার আসকালানী , ফাৎহুল বারী , (কিতাবুল মানাকিব ১৪তম খন্ড , পৃ.২২৩০)

[91] ইবন হিশাম, *প্রাগুক্ত,* ১ম খন্ড, পৃ.১৫৯-১৬০।

কোনো কোনো বর্ণনা মতে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শুভ জ ন্মের সপ্তম দিবসেই "আব্দুল মোত্তালিব" তাঁর নামে আক্বীকা[92] দিয়েছিলেন এবং কুরাইশ গোত্রের সকলকে দা 'ওয়াত করেছিলেন।[93] তাঁর মায়ের স্বপ্নে আদিষ্ট নাম সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁর দাদা নাম রাখলেন "মুহাম্মদ"। আরবে এ নাম ছিল সম্পুর্ণ অপরিচিত। ফলে লোকেরা এ নাম শ্রবণে বিস্মিত হত।[94]

---

[92] আক্বীকা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর সুন্নত। তৎকালীন আরব সমাজে ইহার ব্যাপক প্রচলন ছিল। নবজাতকের নামকরণ ও কেশমূন্ডণ উপলক্ষে পশু কুরবানীর নাম 'আক্বীকা'। (*সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* , ১ম খন্ড , ই.ফা.বা, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৮)।

[93] ইবন কাছীর, *আস্-সিরাতুন নবুবিয়্যা*, ১ম খন্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১০ ; মুহাম্মদ ইদ্রিস কান্দাহলবী, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৬১।

[94] ইবন হিশাম, *প্রাগুক্ত*, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫৯ ; ইবন কাছির, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* , ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র নাম "মুহাম্মদ" ইলহামী সূত্রে রাখা হয়েছে। সায়্যিদা আমিনা বর্ণনা করেন, "আমি যখন তাঁকে গর্ভধারণ করি তখন অদৃশ্য থেকে কেউ আমাকে বলল, নিঃসন্দেহে তুমি এ উম্মতের সরদার গর্ভে ধারন করেছ। সুতরাং তাঁর নাম রাখবে "মুহাম্মদ"। (ইবন সায়্যিদিন-নাস, *উয়ূনুল আছার ফি ফুনুনিল-মাগাযী ওয়াশ শামাইল ওয়া্স সিয়ার* , ১ম খন্ড , (বৈরুত: দারুর মা'রিফা, তা.বি), পৃ. ৩০)

আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ সোহায়লী , আর রউযুল উ নুফ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোটা ইতিহাসে শুধু তিনজন লোক এমন পাওয়া যায় যারা কিতাবীদের নিকট থেকে একথা শুনে যে, আরব উপদ্বীপে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটতে যাচ্ছে যার নাম হবে 'মুহাম্মদ' তাদেরকে এও বলা হত যে , তাঁর আবির্ভাবকাল নিকটবর্তী , ফলে তাদের গর্ভবতী স্ত্রীদের ব্যাপারে তারা এ রূপ মানত করত যে , যদি পুত্র সন্তান জন্ম হয়, তবে তার নাম 'মুহাম্মদ' রাখবে। (দ্র. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, *নবীয়ে রহমত*, অনু: আবু সাইয়েদ মুহাম্মদ ওমর আলী , (ঢাকা ও চট্রগ্রাম: মজলিশে নাশরিয়াতে ইসলাম, ১৯৯৭), পৃ. ১১৪)।

পবিত্র কুরআনে তাঁর দু 'টি নাম যথাক্রমে "মুহাম্মদ" ও "আহমদ" উল্লেখ রয়েছে। আল-কুরআন , সূরা সফ-৬ ; সূরা আল-ফাতাহ : ২৯। তাঁর "আহমাদ" ও "মুহাম্মদ" নাম দু'টির মধ্যে রয়েছে এক চমৎকার মিল ও অনুপম সাদৃশ্য। "মুহাম্মদ" নামে সকল প্রশংসিত গুলাবলীর আধিক্যের ব্যাপক সমাবেশ ঘটেছে। আর "আহমাদ" নামের মধ্যে নিহিত আছে অন্যান্য সকল গুণাবলীর উপরে একক মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের একচ্ছত্র প্রভাব। ফলে নাম দুটি্একাকার হয়ে গেছে যেমন ঘটে থাকে দেহের সাথে প্রাণের সম্পর্ক। (ইবনুল কাইয়্যেম আল-জাওযিয়্যা, *প্রাগুক্ত,* ১ম খন্ড, পৃ.৭)

এছাড়াও তাঁর অনেক নাম রয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যুবাইর ইবন মুত'ইম (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার পাঁচটি নাম রয়েছে: আমি 'মুহাম্মদ', আমি 'আহমদ', আমি 'মাহী' নিশ্চিহ্নকারী, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কুফরকে নিশ্চিহ্ন করবেন। আমি 'হাশির' সমবেতকারী, আমি 'আকেব' শেষ আগমনকারী (দ্র. ইবন হাজর আসকালানী, *প্রাগুক্ত,* ৬ ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৬৪১ হাদীস নং ৩৫৩২ ;

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পিতাকে দেখেন নি। তাঁর মমতাময়ী মাতা অন্তঃসত্তা থাকা অবস্থায় আব্দুল্লাহ খেজুর ক্রয়ের জন্য মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সেখানে তিনি মামার বাড়ি বনু আদী ইবন নাজ্জার গোত্রে মৃত্যুবরণ করেন।[95]

তিনি তাঁর দাদা আব্দুল মোত্তালিবের স্নেহ পরশে লালিত পালিত হতে থাকেন। অতএব , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতীম অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَـَٔاوَىٰ ۝٦ ﴾ [الضحى: ٦]

"তিনি কি আপনাকে এতিম অবস্থায় পাননি ? এরপর তিনি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন।"[96]

ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* ১৫শ খন্ড, পৃ. ১০৪-১০৫; আল-বয়হাকী, *দালাইলুন নবুওয়্যাহ,* ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫-১৫৬)।

[95] ইবন সা'দ, আত্ *তাবাকাতুল কুবরা,* ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬ ; ইবনে সা'দ মুহাম্মদ ইবন কা 'ব হতে বর্ণনা করেন , তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ সিরিয়ার বাণিজ্য হতে ফেরার পথে পথিমধ্যে ইন্তেকাল করেন।

[96] আল-কুরআন, সূরা আদ্ দুহা : ৬ ।

শৈশব কাল

দুগ্ধপান : মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মের পর সাতদিন মাতৃদুগ্ধ পান করেন। তারপর আটদিন ছুয়াইবার [97] দুগ্ধ পান করেন। ছুয়াইবার পর খাওলা বিনতে মুনযেরসহ আরও তিনজন মহিলা তাঁকে দুধ পান করিয়েছিলেন। [98] কিছুদিন পর হালিম সা'দিয়া এ সৌভাগ্যের অধিকারী হন। সে সময় আরবের সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় গোত্রসমূহের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, তারা স্ব স্ব সন্তানকে শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রতিপালন করা পছন্দ করত। এতে শিশুদের দৈহিক স্বাস্থ্য সুন্দররূপে বিকাশ লাভ করত এবং তারা বিশুদ্ধ ও শ্রুতিমধুর আরবী ভাষা আয়ত্ত করতে পারত। চিরন্তন প্রথানুসারে গ্রামাঞ্চলের ধাত্রীরা সম্ভ্রান্ত ও শরীফ পরিবারে সন্তান পাবার আশায় মক্কা শহরে আগমন করত ; এর

---

[97] ছুয়াইবা ছিল আবু লাহাবের দাসী। আব্দুল্লাহর পুত্র সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার সংবাদ সে স্বীয় মালিককে জানালে আনন্দের আতিশায্যে আবু লাহাব তৎক্ষনাৎ তাকে আযাদ করে দেয়। সে সময় তার কোলের শিশুর নাম ছিল মাছরুহ। তাঁর আগে হামজা ইবন আব্দুল মোত্তালিব এবং তাঁর পরে আবু সালমা ইবন আব্দুল আহাদ মাখজুমিকেও ছুয়াইবা দুধ পান করিয়েছিলেন। (দ্র. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওহাব নজদী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৩)।

[98] তাহের সূরাটী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫২৮।

মাধ্যমে তারা পারিতোষক ও সম্মানী লাভ করত। পিতৃহীন বালক প্রতিপালনে যথাযথ সম্মানী ও পারিশ্রমিক না পাবার আশংকায় বনু সা'দ[99] গোত্রের অন্যান্য ধাত্রীরা তাঁকে গ্রহণ করে নি; এমনকি হালিমাও প্রথমে তাঁকে গ্রহণ না করে অগত্যা খালি হাতে ফিরে যাবার সময় শিশু মুহাম্মদের লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ফলে হালিমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো।[100] তাঁর অভাব

---

[99] এটি একটি গোত্রের নাম। বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় তারা খুবই পারদর্শী ছিল। মক্কা নগর হতে ৭০ মাইল দূরবর্তী শহর তায়েফের পার্শ্বস্থিত গ্রামে তাদের আবাস ছিল। (দ্র: মাহবুবুর রহমান , *মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫), পৃ. ৩৯)।

[100] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুধ মাতা হলেন , বনু সা'দ ইবন বকরের জনৈকা মহিলা হালিমা বিনত্ আবু যুবায়র। হালিমা সা 'দিয়া বলেন : আমি দুদ্ধপোষ্য শিশুর সন্ধানে বনু সা 'দ গোত্রের অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে তায়েফ হতে সাদা গাঁধার পিঠে সওয়ার হয়ে মক্কায় রওয়ানা হই। সে বছর দেশে দূর্ভিক্ষ বিরাজ করছিল। আমার কোলেও একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিল কিন্তু আমার স্তনে এই পরিমাণ দুগ্ধ ছিল না যা তার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। সারারাত সে ক্ষুধায় কাতরাত আর আমরা বিনিদ্র রজনী যাপন করতাম। আমাদের একটি উটনীও ছিল , কিন্তু তার স্তনে তখন দুগ্ধ ছিল না। আমার আরোহিত উষ্ট্রীটি এত দূর্বল ছিল যে , মক্কায় পৌঁছাতে অনেক সময় লেগে যায়। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এতিম ভেবে আমাদের মধ্যে কেউই গ্রহণ করল না। এদিকে বিলম্ব হওয়ায় আমি ও অন্য কোন শিশু

অনটন দুরীভূত হয়ে প্রাচুর্যতা ও সচ্ছলতা ফিরে এলো এবং বান্ধবীরা তাঁর ঈর্ষায় মেতে উঠতে লাগল। এরূপে তাঁর গৃহে অতি আদর-যত্নে সুদীর্ঘ দু 'বছর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লালিত পালিত হন।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৈহিক ক্রম বিকাশ অন্যান্য শিশুদের তুলনায় হৃষ্টপুষ্ট ও মোটা ছিল। এমনকি দু 'বছর বয়সে তাঁকে খুব বড় দেখাত। প্রথানুযায়ী তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে আসা হল , কিন্তু হালিমা শিশুটিকে আরও কিছুদিন প্রতিপালনের আকাংখা ব্যক্ত করেন। বিবি আমেনা হালিমার

পোষ্য পাইনি। আমি আমার স্বামীকে বললাম , অগত্যা শুন্য হাতে ফিরে যাওয়ার চেয়ে এ এতিম শিশুটিকে নিয়ে যাওয়াই ভাল। আমার স্বামী এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন। ফলে তিনি এতিম শিশুকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। তাঁবুতে এসে দুগ্ধ পান করাতে বসার সঙ্গে সঙ্গে বরকত ও কল্যাণের অজস্রধারা প্রকাশ পেতে লাগল। হালিমা বলেন , আমার স্বামী উটনীর দুধ দোহন করে আসলেন এবং আমরা সকলেই তৃপ্তি সহকারে পান করলাম। বহুদিন পর সারারাত আরামে কাটালাম। আমাদের দুর্বল উষ্ট্রী অত্যন্ত সবল হয়ে গেল এবং সবাইকে পিছনে রেখে গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম। (ইবন হিশাম , *প্রাগুক্ত*, ১ম খন্ড, পৃ. ১৬৭-১৬৯)।

আকুতি দেখে শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পুণরায় তার নিকট ফিরিয়ে দেন।[101]

হালিমার গৃহে থাকাকালীন সময়ে তিনি স্বীয় দুধ ভাইদের সাথে খেলাধুলার উদ্দেশ্যে মাঠে যেতেন। এ সময় একদা জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আগমন করলেন এবং দেখলেন যে , মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলা করছেন। তিনি তাঁকে ধরে শুইয়ে দিলেন এবং বক্ষ বিদীর্ণ করে তাঁর হৃৎপিন্ডটি বের করে আনলেন। তারপর তিনি তাঁর বক্ষ হতে একটি রক্তপিন্ড বের করলেন এবং বললেন , এ অংশটি হল শয়তানের। এরপর জিব্রাইল আলাইহিস সালাম হৃৎপি ণ্ডটি একটি স্বর্নের পাত্রে রেখে যমযমের পানি দিয়ে ধুইলেন এবং তার অংশগুলো জড়ো করে আবার তা যথাস্থানে পূনঃস্থাপন করলেন। অন্য শিশুরা ছুটে বিবি হালিমার কাছে গিয়ে বললো , মুহাম্মদকে মেরে ফেলা হয়েছে। পরিবারের লোকেরা ছুটে এসে দেখলো তিনি বিবর্ণমুখে বসে আছেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্ষে সেই সিলাই এর

---

[101] ইবনে হিশাম, *প্রাগুক্ত*, ১ম খন্ড, পৃ. ১৬২-১৬৪।

চিহ্ন দেখেছি।[102] সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিল চার বা পাঁচ বছর।[103] এভাবে পরবর্তীতেও তাঁর বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে।[104] এদিকে ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহ বলেন,

---

[102] ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* ১ম খন্ড, (কিতাবুল ঈমান, বাবুল ইসরা), পৃ.৯২।

[103] অধিকাংশ সীরাত রচয়িতা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (ইবন সা ’দ, *প্রাগুক্ত,* ১ম খন্ড, পৃ.১১২) কিন্তু ইবন ইসহাকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে , তিন বছর বয়সে এ ঘটনা ঘটেছিল। (ইবন হিশাম , *প্রাগুক্ত,* ১ম খন্ড, পৃ. ১৬৪-১৬৫)।

[104] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোটা জীবনে বক্ষবিদারনের ঘটনা মোট চারবার সংগঠিত হয়েছে। প্রথমবার শৈশবে , দ্বিতীয়বার দশ বছর বয়সে, তৃতীয়বার যখন তিনি চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হন এবং চতুর্থবার মে’রাজে যাওয়ার প্রাক্কালে সংগঠিত হয়। (মুহাম্মদ ইদ্রীস কান্দাহলভী , প্রাগুক্ত,১ম খন্ড, পৃ. ৭৭-৭৮) প্রথমবার তাঁর কলব হতে জমাট বাধা কালো অংশ যা পাপের উৎস তা পবিত্র পানি দ্বারা ধৌত করা হয়। দ্বিতীয়বার যেহেতু দশ বছর বয়সে তিনি উপনীত হয়েছেন এবং এ মূহুর্তে তাঁর মন মানসিকতা বালকসূলভ হওয়ায় খেলাধুলার দিকে বেশী ঝুঁকে পড়া স্বাভাবিক ছিল তাই , এ প্রবণতাকে দূর করার জন্য এ পর্যায়ে বক্ষবিদীর্ণ হয়। তৃতীয়বার ওহী লাভের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম রহস্যাবলী এবং আল্লাহর কালামকে ধারণের যোগ্য করে তোলা হয়েছে। চতুর্থবার তাঁর দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক হতে আল্লাহর দর্শন লাভে ও মহাসৃষ্টির গুরু রহস্যাবলী পরিদর্শনের উপযুক্ত করে দেয়া। (মুহাম্মদ ইদ্রীস কান্দাহলভী , প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৮৩-৮৪)।

﴿أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ ۝١﴾ [الشرح: ١]

"হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি কি আপনার বক্ষকে বিদীর্ণ করে দেইনি?"[105]

এঘটনার পর তিনি (হালিমা) ভীত হয়ে পড়লেন এবং শিশুকে তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন।[106] মা আপন সন্তানকে সুস্থ সবল দেখে প্রীত হন এবং স্নেহ ভালবাসা ও আদর সোহাগ দিয়ে লালন-পালনে সচেষ্ট হন। তাঁর দেখাশুনা ও তত্বাবধানের জন্য স্বীয় পরিচারিকা উম্মু আয়মানকে নিযুক্ত করেন।[107]

তাঁর বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁর মা তাঁকে দাদার মাতৃকুলকে দেখাবার নিমিত্তে তাঁকে ইয়াসরিব নিয়ে যান। তিনি তাঁর প্রিয়তম স্বামী আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল মোত্তালিবের কবর যিয়ারতের ইচ্ছুক

---

[105] আল-কুরআন, সূরা আশ্ শরাহ : ১।

[106] ইবন হিশাম, *প্রাগুক্ত,* ১ম খন্ড, পৃ. ১৬৮

[107] তার আসল নাম বারাত , তিনি আবিসিনিয়ার অধিবাসী ছিলেন। 'উবায়দ ইবনুল হারিছ' আল-খাযরাজীর সাথে প্রথম তার বিয়ে হয়। এ ঘরে আয়মান নামক একজন পুত্র জন্মে। এ সুত্রেই তার নাম হয় উম্মে আয়মান। উপরন্তু তার মৃত্যুর পর তিনি যায়দ ইবন হারিছের সাথে পরিবার সূত্রে আবদ্ধ হন। (*ইসলামী বিশ্বকোষ,* প্রাগুক্ত, ২০শ খন্ড, পৃ. ৫৭১-৫৭২)।

ছিলেন।[108] মক্কা প্রত্যাবর্তনের পথে 'আল-আবওয়া'[109] নামক স্থানে বিবি আমেনা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং কিছুদিন পর সেখানেই মারা যা ন। মাতৃবিয়োগের শোকে তিনি তখন বি হ্বল হয়ে উঠেন; উম্মে আয়মান তাঁকে মক্কায় নিয়ে আসেন এবং দাদা আব্দুল মোত্তালিবের নিকট সোর্পদ করেন।

এরপর তিনি দাদার স্নেহ ছায়ায় অবস্থান করেন , তিনি তাঁকে অত্যধিক ভালবাসতেন এবং সব সময় নিজের সঙ্গে রাখতেন। কাবা শরীফের ছায়ায় স্বীয় ফরাশের উপর সাথে নিয়ে বসতেন এবং নানাভাবে স্নেহ ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটাতেন।[110] দু'বছর যেতে না যেতেই তাঁর বয়স যখন আট হল তখন তাঁর দাদা এ

---

[108] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সফরের কিছু কিছু ঘটনা বর্ণনা করতেন। হিজরতের পর তিনি বনী নাজ্জারের ঘর বাড়ী দেখে বলেন , আমার মা এখানেই অবতরণ করেছিলেন এবং বনী আদী ইবন্ নাজ্জারের বাউলীতে (সিড়ি যুক্ত বড় কুয়া) আমি খুব লাফালাফি করেছিলাম। (দ্র : আয যারকানী , *শারহ' আল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়া,* ১ম খ ণ্ড, (মিসর: আল মাতবা 'আতুশ শাফেঈয়্যাহ, তা.বি.), পৃ.১৬৭-১৬৮)।

[109] জায়গাটি মস্তুরার নিকটবর্তী যা এখন মক্কা ও মদিনার মাঝখানে সুপ্রসিদ্ধ স্থান।

[110] ইবন হিশাম, *প্রাগুক্ত,* ১ম খন্ড, পৃ. ১৬৮।

অস্থায়ী জগত ছেড়ে চিরস্থায়ী জগতে পাড়ি জমান। এভাবে শিশুকালেই যাবতীয় শিক্ষা , প্রশিক্ষন ও প্রতিপালনের বস্তুগত উপকরণ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়ে এক ও অপরিসীম ক্ষমতাধর বেনিয়াজ আল্লাহর শিক্ষা-প্রশিক্ষন ও প্রতিপালনের জন্য নির্বাচিত হন।

আব্দুল মোত্তালিব মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় পুত্র আবু তালেবকে ওসিয়ত করে গেলেন ; তিনি যেন ভাতৃষ্পুত্রের বিশেষভাবে যত্ন নেন। আব্দুল্লাহ ও আবু তালিব উভয়ে ছিলেন সহোদর ভাই। পিতার অন্তিম উপদেশ এবং নিজের স্বাভাবিক স্নেহবশতঃ আবু তালিব এতিম ভাতিজার প্রতিপালন করতে থাকেন। তিনি তাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখতেন। শোবার সময় এবং কোথাও বেড়াতে গেলেও তাঁকে ছাড়া যেতেন না। বয়োঃবৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ও চরিত্র মাধুরী এমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল যে, আবু তালিব তা দেখে এতিম ভাতিজার প্রতি আরও বেশী অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভাতিজার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ মমতা অক্ষুন্ন ছিল।

কর্মময় জীবন

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন থেকে তাঁর চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে জীবন যপন করতে আরম্ভ করেন , তখনই তিনি তাকে সহযোগিতা করার ইচ্ছা পোষণ করেন। আবু তালিব নিজের পরিবারের সদস্য বেশী হওয়ায় ও আর্থিক দীনতার কারণে সাহায্যের মুখাপেক্ষীও ছিলেন। ফলে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার পাহাড়ী রাস্তায় চাচা আবু তালিবের ছাগল চরাতেন ; এর মাধ্যমে তিনি আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সাথে লেনদেন করার সুযোগ পেতেন , যা পরবর্তীতে তাঁর ব্যবসা পরিচালনায় ও নেতৃত্বদানে সহায়ক ভুমিকা পালন করেছিল। এ মর্মে তিনি বলেন , "প্রত্যেক নবীই ছাগল চরিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করেন, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনিও ? তিনি বলেন হ্যাঁ , আমি কিছু ক্বিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীর ছাগল চরাতাম ।[111] বস্তুত ছাগল চরানোর মাধ্যমে আল্লাহ তা 'আলা তাঁকে রিসালাত গ্রহণ এবং

---

[111] ইবন হাজর আসকালানী , *প্রাগুক্ত,* ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৫১৬ হাদীস নং-২২৬২ ; ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* ১ম খন্ড, পৃ.৫-৬।

দীনের দা 'ওয়াতের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য যে ধৈর্য ও মমত্ববোধ সৃষ্টি, দুর্বলদের প্রতি সদয় ও স্নেহ প্রবণতা , যথাযথ রক্ষনাবেক্ষণ ও কষ্ট সহি ষ্ণুতা অবলম্বন প্রয়োজন, তার প্রশিক্ষন দিয়েছিলেন। তাছাড়াও বকরী চরানোর পেশা সেই যুগে জীবিকা অর্জনের একটি অভিজাত উপায় হওয়ার সাথে সাথে মানসিক ও মনস্তাত্বিক প্রশিক্ষন, দুর্বল ও অভাবী লোকদের উপর স্নেহ ও ভালবাসার প্রেরণা সৃষ্টি, স্বচ্ছ ও নির্মল বায়ুর আমেজ লাভ এবং শরীরের শক্তি ও ব্যায়ামের উপকরণ ও বটে।

পঁচিশ বছর বয়সে তিনি আরবের বিশিষ্ট ধনবতী ও অভিজাত মহিলা খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদের বানিজ্যিক পণ্য পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণের মাধ্যমে আর্থিক দীনতা মোচন করতে সক্ষম হন। পবিত্র কুরআনুল কারীমে এ মর্মে ঘোষিত হয়েছে

﴿ وَوَجَدَكَ عَآئِلٗا فَأَغۡنَىٰ ٨ ﴾ [الضحى: ٨]

"আর আপনি কি নিঃসম্বল ছিলেন না ? পরে আল্লাহ আপনাকে সম্বল দান করেছেন।"[112]

112 আল-কুরআন, সূরা আদ দোহা : ৭।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবাহ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজার বাণিজ্যিক কাফেলা পরিচালনার মধ্যে তাঁর উন্নত চরিত্র, সততা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি গুণ প্রকাশ পেল। ফলে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহু মনের অজান্তেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবেসে ফেললেন। তিনি স্বীয় ভৃত্য মায় সারার কাছে তা ব্যক্ত করলেন এবং বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচাদের সাথে পরামর্শ করে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সিরিয়া থেকে বাণিজ্যিক সফর শেষে ফিরে আসার দু 'মাস পর তিনি খাদিজার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।[113] তখন তিনি পঁচিশ বছরের যুবক , আর খাদিজার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের মোহরানা হিসেবে

---

[113] খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন তৎকলীন আরবের একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মহিলা। তিনি বিবেক বুদ্ধি , সৌন্দর্য, অর্থ সম্পদ, বংশমর্যাদায় ছিলেন সে কালের শ্রেষ্ঠ নারী। সেসময় নারীদের অধিকার বলতে কিছুই ছিল না এবং তারা চরম অবমাননা ও লাঞ্চনা স্বীকার হত। এই পবিত্রা মহিলা তখন স্বীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে জাহিলিয়াতের যুগেও লোকজন তাকে 'তাহিরা' ভূষিত করে। (ইদ্রিস কান্দাহলভী , *প্রাগুক্ত,* ১ম খন্ড, পৃ.৯৯)।

বিশটি উট দিয়েছিলেন।[114] এটি ছিল তাঁর (মুহাম্মদ সা.) প্রথম বিবাহ। খাদিজা বেঁচে থাকা অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন নি।[115]

ইবরাহীম ব্যতিত রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল সন্তান ছিলেন বিবি খাদিজার গর্ভজাত। তাঁর গর্ভে একজন পূত্র সন্তান ও চারজন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পূত্র সন্তানের মধ্যে কাসেম সবার জৈষ্ঠ্য এবং শৈশবেই মারা যায়। আর কন্যারা হলেন যথাক্রমে যয়নব , রোকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না। তারা সকলেই ইসলামের যুগ পেয়েছিলেন এবং ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন।

চরিত্র মাধুর্য

বাল্যকালেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কাওম কর্তৃক 'আস্ সাদিক ' বা সত্যবাদী উপাধিতে ভূষিত হন।

---

[114] ইবন খালদুন, *তারীখে ইবন খালদুন,* প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ২৫-২৬।

[115] ইবন হিশাম, *প্রাগুক্ত,* ১ম খন্ড, পৃ. ১৯০-১৯১ ; মুহাম্মদ আল গাযযালী, *ফেকহুছ সীরাত*, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৩৭০ হি.), পৃ.৬০ ; ইবন হাজর আসকালানী, *প্রাগুক্ত,* ৭ম খন্ড, পৃ. ১০৫।

আমানতদার, দৃঢ়তা, সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা, সাধুতা, স্বভাবগত চারিত্রিক মাহাত্ম্য প্রভৃতি গুণে তিনি গু   ণান্বিত ছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর মর্যাদাকে জাহেলী সমাজেও সুউচ্চ করে দিয়েছেন।[116] জাহিলিয়াতের নাপাক ও খারাপ অভ্যাসসমূহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে স্বজাতির নিকট সবচেয়ে বেশী প্রশংসনীয় গুণাবলী, উন্নত মনোবল , লাজনম্র ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তিনি। কিশোর বয়সের সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, নম্রতা ও ভদ্রতা, নিঃস্বার্থ মানবপ্রেম ও সত্যিকার কল্যাণ প্রচেষ্টা , চরিত্র মাধুর্য ও অমায়িক ব্যবহারের ফলে আরবগণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। অবশেষে আরবগণ তাঁকে আল-আমিন বা বিশ্বস্ত বলে ডাকতে থাকে। ফলে মুহাম্মদ নাম অন্তরালে পড়ে গিয়ে তিনি আল-আমিন নামে খ্যাত হয়ে উঠলেন। নীতিধর্ম বিবর্জিত, ঈর্ষা-বিদ্বেষ কলূষিত, পরশ্রীকাতর দুর্ধর্ষ আরবদের অন্তরে এতখানি স্থান লাভ করা ঐ সময়ে খুবই কঠিন ছিল। অনুপম চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী হওয়ার কারণেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষে তা

---

116 আল-কুরআন, সূরা আশ্ শরাহ : ৪।

সম্ভব হয়েছিল। [117] এমন কি তারা বিভিন্ন জটিল বিষয়াদি মীমাংসার ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত কামনা করত। কুরাইশ বংশের সকল গোত্রে কাবাগৃহে হাজারে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে যে তীব্র বিতন্ডা ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আশংকা দেখা দিয়েছিল তাও তিনি যুক্তিপুর্ণ উপায়ে অত্যন্ত বিচক্ষনতা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে

---

[117] এ মর্মে সীরাতে ইবন হিশামে বর্ণিত আছে,

فشب رسول الله صلى الله عليه و سلم يكلأه و يحفظه و يحوطه من أقذار الجاهلية لما يريد به من كرامة، و رسالة، حتى بلغ، إلى إن كان أفضل قومه مروءة و أحسنهم خلقا و أكرمهم حسبا و أحسنهم حوارا و أعظمهم حلما و اصدقهم حديثا و أعظمهم أمانة و أبعدهم من الفحش و الأخلاق التي دنس الرجال تنزها و تكرما اسمه في قومه الآمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة.

“অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থায় রয়ঃপ্রাপ্ত হতে লাগলেন যে, স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁকে হেফাজত ও তাঁর প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং জাহিলিয়াতের সমস্ত অনচার থেকে তাঁকে পবিত্র রাখেন। কেননা তাঁকে নবুওয়ত ও রিসালাতের উচ্চ মর্যাদায় আসীন করা ছিল মহান আল্লাহর অভিপ্রায়। ফলে তিনি একজন নম্র , ভদ্র, চরিত্রবান, উত্তম বংশীয়, ধৈর্যশীল, সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যক্তি হিসেবে সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। অশ্লীলতা ও অনৈতিকতা হতে সর্বদা দূরে থাকতেন। এ সকল উত্তম ও নৈতিক গুণাবলীর কারণে স্বজাতির মধ্যে তিনি আল-আমিন খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। (ইবন হিশাম, *প্রাগুক্ত,* ১ম খন্ড, পৃ. ৬২)।

মীমাংসা করেছিলেন।[118] এভাবে তিনি সর্বজনবিদিত ও নিরপেক্ষ একজন বিচারকের মর্যাদায় আসীন হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র মাধুর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে স্বয়ং মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤ ﴾ [القلم: ٤]

“নিশ্চয় আপনি উত্তম চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত ।”[119]

মূলতঃ তাঁর চরিত্র হল পবিত্র কুরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাঁর গোটা জীবন কাহিনী তথা সীরাত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁর চরিত্রে ছিল ভীতিজড়িত বিনয় , বীরত্ব ও সাহসিকতা মিশ্রিত লজ্জা , প্রচার বিমুখ দানশীলতা , সর্বজনবিদিত আমানতদারী, বিশ্বস্ততা, কথা ও কাজে সত্য ও সততা , পার্থিব ভোগ বিলাস থেকে সম্পূর্ণ বিমুখতা , নিষ্ঠা, ভাষার বিশুদ্ধতা ও হৃদয়ের দৃঢ়তা, অসাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা , ছোট-বড় সকলের প্রতি দয়া ও ভালবাসা, নম্র আচরণ, অপরাধীর প্রতি ক্ষমাপ্রিয়তা,

---

[118] আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতুম,* অনূ: খাদিজা আখতার রেজায়ী (আল-কুরআন একাডেমী লন্ডন,১ম সংস্করণ ২০০৩), পৃ.৭৮।

[119] আল-কুরআন, সূরা আল্ কলম : ৪।

বিপদাপদে ধৈর্য ও সত্য বলার দুর্বার সাহসিকতা। তাঁর প্রিয় সহধর্মিনী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর দৃষ্টিতে-

«كان خلقه القرآن»

“পবিত্র কুরআনই ছিল তাঁর চরিত্র।”[120]

সমাজের দুর্বল অসহায় ও নির্যাতিতদের অবস্থা দৃষ্টে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও বি হ্বল হয়ে পড়তেন ; তাদের মুক্তি নিশ্চিত করার নিমিত্তে সারাক্ষণ চিন্তা করতেন। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত যাবতীয় অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, পাপাচার, মুর্তিপূজা তাঁকে পীড়া ও মর্মন্তুদ করত। এসব নিরসনকল্পে সমাজে শান্তি ও মুক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি “হিলফুল ফুযুল”[121] নামক একটি শান্তি সংঘে

---

[120] ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, *প্রাগুক্ত,* ১ম খন্ড, পৃ. ৭৪৬।

[121] হিলফুল ফুযুল (حلف الفضول)-এর হিলফ শব্দের অর্থ পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্যের অঙ্গীকার। (দ্র.ইবন মানযুর , *প্রাগুক্ত,* ২য় খন্ড , পৃ. ৯৬৩) সুদুর অতীতে আল-ফাদল নামক কয়েকজন শান্তিপ্রিয় লোকের উদ্যোগে মক্কায় সামাজিক শান্তি-শৃংখলা ও জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই ইতিহাসে হিলফুল ফুযূল নামে প্রসিদ্ধ। এ সংঘের মাধ্যমে তারা সমাজ হতে যাবতীয় অন্যায় অবিচার দূর

যোগ দিয়েছিলেন। নবুওয়ত পাওয়ার পর এ ঘটনার উলেখ করে তিনি বলতেন , আমি আব্দুল্লাহ ইবন জুদ 'আনের ঘরে এমন

করে শান্তি , শৃংখলা ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল। ফলে তাদের অঙ্গীকার ছিল নিম্নরূপ :

تحالفوا أن ترد الفضول على أهلها و إلا يغزو ظالمٌ مظلوماً.

"তারা (জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়া) 'ফুদূল' মাল তার প্রাপককে ফিরিয়ে দিবে এবং শক্তিহীনদের উপর শক্তিমানদের অত্যাচার প্রতিহত করবে ।" (ইবন হিশাম, *সীরাতুন নাবাবিয়্যা,* প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১৩৯)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবু ওয়ত লাভের বিশ বৎসর পূর্বে যিলকদ মাসে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। (*প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৪০ ; ইবন সা'দ, *প্রাগুক্ত,* ১ম খন্ড, পৃ. ১২৮) আব্দুল্লাহ ইবন জুদ 'আনের বাড়ীতে এ মহানুভবতামূলক চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল বিশ বছর। নবুওয়তপ্রাপ্তির কোন এক সময়ে তিনি এ সম্পর্কে বলেন,

«لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما احب أن لي به حمر النعم ولو دعيت به في الإسلام لأجبت».

"আব্দুল্লাহ ইবন জুদ'আনের গৃহে অনুষ্ঠিত শপথ অনুষ্ঠানে আমি আমার চাচাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছি। তার বিনিময়ে আমাকে লালবর্ণের উষ্ট্রী প্রদান করা হলেও আমি সন্তুষ্ট হব না। ইসলামী সমাজেও যদি কেউ আমাকে ইহার জন্য ডাকে তবে আমি অবশ্যই সাড়া দিব। " (হাকেম আন্ নিশাপুরী, *মুসতাদরাকে হাকেম,* ২য় খন্ড , (হায়দারাবাদ: দায়েরাতুল মা 'আরেফ আল ওসমানীয়া , তা.বি) পৃ.২২০ ; ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল , *মুসনাদে আহমাদ,* প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১৯০-১৯৪)।

চুক্তিতে শরীক ছিলাম , যার বিনিময়ে লাল উটও আমার পছন্দ নয়। ইসলামী যুগে সে চুক্তির জন্যে যদি আমাকে ডাকা হতো তবে আমি অবশ্যই উপস্থিত হতাম। [122] সুতরাং তাঁর স্বগোত্রের লোকেরা যে সকল মূর্তির উপাসনায় লিপ্ত ছিল , সেগুলোর প্রতি ছিল তাঁর ঘৃণা এবং সমস্ত বিকৃত আকীদা বিশ্বাস যা সমসাময়িক বিশ্বকে ভ্রান্তির আঁধারে নিমজ্জিত করেছিল তার প্রতি ছিল অশ্রদ্ধা।

নবুওয়ত লাভ

সমাজের অন্যায়-অবিচার , জুলুম-নির্যাতন, মূর্তিপূজাসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কার্যাদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মনে খুব নাড়া দিত এবং তিনি নিজের ভেতর এক ধরনের অদৃশ্য ও অনিশ্চিত অস্থিরতা অনুভব করতেন ; মানসিক চিন্তায় বিভোর থাকতেন। এ অবস্থায় একাকীত্ব ও নির্জনতাপ্রিয়তা তাঁর নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। নবুওয়ত প্রাপ্তির দিকে তিনি যতই

---

[122] ইবন হিশাম, *প্রাগুক্ত,* ১ম খন্ড, পৃ. ১৩৩-১৩৫ ; শেখ আব্দুল্লাহ, *মুখতাছারু সিরাত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১ ; মাওলানা আজিজুল হক , *বোখারী শরীফ ,* (বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা) ৫ম খন্ড, (ঢাকা : তা.বি.), পৃ. ৮২।

অগ্রসর হচ্ছিলেন, ততই তাঁর চিন্তাশীলতা ও গাম্ভীর্যের গভীরতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এ সময় তিনি প্রায়শঃ গৃহ ত্যাগ করে মক্কার অদুরে হেরা পাহাড়ের গুহায় [123] নির্জনে চলে যেতেন। এমনকি কোন কোন সময় রাত্রেও বাড়ী ফিরতেন না। অনেক সময় এরূপ হত যে, বিবি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিচলিত হয়ে পড়তেন এবং তাঁকে খুঁজে বের করে খাবার ও পানীয় পৌঁছে দিয়ে আসতেন।[124] নির্জনবাসকালীন সময়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের পর রাত বিনিদ্র কাটিয়ে দিতেন , দিনের পর দিন রোযা রাখতেন।[125] এ সময় তাঁর কাছে যত দরিদ্র লোক আসতো তিনি তাদেরকে খাবার ও পানীয় দান করতেন। নির্জনবাস শেষে বাড়ী ফিরবার পূর্বে তিনি সর্বপ্রম কা'বা শরীফে প্রবেশ করে সাতবার বা

---

[123] এটি মক্কা থেকে দুই মাইল দুরে অবস্থিত একটি ছোট গুহা। এর দৈর্ঘ্য চারগজ এবং প্রস্থ পৌনে দুই গজ। নীচের দিক গভীর নয়। ছোট একটা পথের পাশে ওপরের প্রান্তরে সঙ্গমস্থলে এ গুহা অবস্থিত। (আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপূরী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৮৪)।

[124] মাওলানা আজিজুল হক, *প্রাগুক্ত,* ৫ম খন্ড, পৃ. ৮২।

[125] ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল, *মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবন চরিত,* বঙ্গানুবাদ : মাওলানা আব্দুল আউয়াল , (ঢাকা : ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ,১৯৯৮), পৃ. ৬৬।

ততোধিকবার কা 'বা গৃহের তাওয়াফ করতেন।[126] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ নির্জনবাসের জন্য রমযান মাসকে বিশেষ করে বেছে নিতেন। এতে তাঁর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ প্রশান্তি ও চিন্তাশক্তির দৃঢ়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল।[127]

অতঃপর তিনি যখন চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পন করেন , তখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হওয়া আরম্ভ হয়।[128] কেননা, চল্লিশ বছর বয়স হচ্ছে মানুষের পূর্ণতা ও পরিপক্কতার বয়স। এ সময় মানুষের শারিরীক ও আত্মিক শক্তির উৎকর্ষ চুড়ান্তরূপে পরিগ্রহ করে। পবিত্র কুরআন এ বিষয়ে ঘোষণা

﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرۡبَعِينَ سَنَةٗ ﴾ [الاحقاف: ١٥]

---

[126] ইবন হিশাম, *প্রাগুক্ত,* পৃ . ৫৬-৫৭।

[127] মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল, *প্রাগুক্ত,* পৃ.৬৫।

[128] ইবন হাজর আসকালানী , *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৩৪, ৭ম খন্ড, পৃ. ১৩২ও ২২৭ ; ইমাম নববী, *শারহে মুসলিম,* ৪ র্থ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২৪ও ১৮২৭ , ইবন হিশাম, *প্রাগুক্ত,* ১ম খন্ড, পৃ. ২৫১-২৫২।

“অবশেষে সে যখন শক্তি সামর্থের রয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে।”[129]

সুতরাং নবুয়তের ন্যায় গুরু দায়িত্ব বহন ও যথাযথভাবে পালনের এটিই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়কাল।

---

[129] আল-কুরআন, সূরা আল-আহকাফ : ১৫।

রাসূলের দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও কৌশল

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ তা'আলা সত্য দীন সহকারে মানবজাতির মুক্তি ও কল্যাণের পথ নির্দেশক হিসেবে সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক রূপে পাঠিয়েছেন।[130] বাল্যকাল থেকেই আল্লাহ তাঁকে সে কাজের জন্য প্রস্তুত করে নিতে থাকেন। জাহেলিয়াতের নাপাক ও খারাপ অভ্যাসসমূহ থেকে আল্লাহ তা 'আলা তাঁকে সর্বদাই দূরে ও মুক্ত রাখেন।[131]

---

[130] আল্লাহর বাণী

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ۝٤٥ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ وَسِرَاجٗا مُّنِيرٗا ۝٤٦ ﴾ [الاحزاب: ٤٥، ٤٦]

"হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা, ভীতিপ্রদর্শক, আল্লাহর দিকে আহবানকারী এবং জ্বলন্ত প্রদীপরূপে প্রেরণ করেছি।" আল-কুরআন, সূরা আহযাব : ৪৫।

[131] নবুয়তের পূর্বে আরবে যে শির্ক ও মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল তা থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। তিনি কখনও কোন মূর্তির সামনে মাথা নত করেন নি। মূর্তির নামে পশু যবেহ করেননি এবং যবেহকৃত কোন প্রাণীর গোশতও ভক্ষন করেননি, তখন থেকেই তাঁর মনে তাওহীদের ধারণ বদ্ধমূল ছিল। (ড. আবুল কালাম পাটওয়ারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭) নবুয়তের পূর্বে মক্কায় কোন অশ্লীল কাজে তিনি কখনও অংশগ্রহণ করেন নি। এ মর্মে তিনি বলেন, "আমি একদা

চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তায় তিনি ছিলেন এক অনন্য ও ব্যতিক্রমধর্মী আদর্শবান বালক। তৎকালীন সমাজ তাঁকে সবচেয়ে বেশী প্রশংসনীয় গুণাবলী , উন্নত মনোবল, উত্তম চরিত্রে বিভূষিত, লাজনম্র, সত্যবাদী, আমানতদার, কটুক্তি ও অশ্লীল বাক্য উচ্চরণ থেকে দূরে বলে ধার ণা করত। এমনকি তাঁর জাতির লোকেরা তাঁকে "আল্ আমিন " (বিশ্বস্ত, আমানতদার) নামে আখ্যায়িত করে।[132] তাঁর দাদা আরবের কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সামনে তাঁকে সাইয়্যেদ বা নেতা বলে ডাকতেন।[133] আল্লাহ প্রথম

পারিবারের ছাগল চরাচ্ছিলাম। এক রাতে আমি আমার সঙ্গীকে বললাম , আমার ছাগলগুলো দেখশুনা কর। আমি মক্কা যাব এবং যুবকরা যেখানে কিচ্ছা-কাহিনী শুনে আমিও শুনব। সাথী বলল যাও । আমি মক্কায় আসলাম , সেখানে এক ঘরে কৌতুক ও ঢোল-বাজনার শব্দ পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম , এখানে কি হচ্ছে ? আমাকে বলা হলো: অমুক ব্যক্তি অমুক মহিলাকে বিবাহ করছে। আমি দেখার উদ্দেশ্যে বসে পড়লাম। তৎক্ষনাৎ আল্লাহ আমার চোখে নিদ্রা চেপে দিলেন। আল্লাহর কসম ! আমি রৌদ্রের খরতাপে জাগ্রত হলাম। কিছুই দেখতে পেলাম না। (জালালুদ্দীন সুয়ূতী , *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৫৬) তবে বর্ণনাটি দুর্বল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ ধরনের কোন ইচ্ছাও সংঘটিত হয় নি।

[132] ইবন হিশাম, *সীরাত,* প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১৮৩।

[133] ইবন কাছীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত,* ১ম খন্ড, পৃ. ২৫২।

থেকেই তাঁকে মহান দা 'ওয়াতের জন্য উত্তম চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষন দিয়েছেন। সুতরাং নৈতিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুপ্রশিক্ষিত।

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে দৈহিক কষ্ট সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, পরিশ্রমপ্রিয়তা ও সততা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও আনুগত্য করার জন্য তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরুপে সপে দেয়ার মাধ্যমে দা 'ওয়াতের জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ইবাদাত করার মাধ্যমে তিনি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন। স্বীয় আত্মাকে পবিত্র ও শক্তিশালী করেন এবং আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ন হয়ে উঠেন। স্নেহ, মমতা ভালবাসা ধৈর্য, কষ্ট ও পরিশ্রমপ্রিয়তাসহ সকল গুণে গুণান্বিত হয়ে নিজেকে দৈহিক , মানসিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিক দিয়ে প্রস্তুত করার পর ওহীর জ্ঞানে সমৃদ্ধ হন। অতএব দা'ওয়াতের সূচনালগ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিগত প্রস্তুতির মাধ্যমে নিজকে দা 'ওয়াতের উপযোগী করে গড়ে তুলেছিলেন। কেননা ইসলামী দা 'ওয়াতের প্রভাব হলো , ব্যক্তি নিজে যে আদর্শের প্রতি ঈমান এনেছে , তা কতটুকু তার

হৃদয়ে শিকড় স্থাপন করেছে এবং বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে এর উপর ভিত্তি করেই স্বীয় পরিবার , পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর উপর প্রভাব পরে। এজন্যে প্রয়োজন ব্যক্তির প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিগত প্রস্তুতি গ্রহণ , যা তাকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে , যুগে যুগে সকল নবী-রাসূল নিজেদেরকে প্রথমে এ কাজের জন্য উপযোগী করে গড়ে তুলেছেন ব্যক্তিগত প্রস্তুতির মাধ্যমে।

দা'ওয়াতের সূচনা

হেরা গুহায় প্রথম ওহী নাযিল হওয়ার মধ্য দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়ত, আর সূরা আল-মুদ্দাসসিরের মাধ্যমে রিসালাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। সূরা 'আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জ্ঞান অন্বেষণের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। তৎকালীন সমাজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহন করেছিল। বিশেষতঃ সাহিত্যের অঙ্গনে তাদের বিচরণ ছিল অত্যাধিক। এজন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দা 'ওয়াতের কাজ আ ঞ্জাম

দেয়ার প্র স্তুতিস্বরূপ জ্ঞান অর্জন করার আহবান জানানো হয়। কারণ আল্লাহর পথে মানুষদেরকে যিনি দা ‘ওয়াত দিবেন, তাঁকে অবশ্যই উদ্দিষ্ট বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। এটি আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর জ্ঞান , যা মানুষদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে, বাতিলের পথ থেকে হকের পথে , সন্দেহ-সংশয় থেকে বিশ্বাসের পথে চলতে সাহায্য করে। কিন্তু পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় ওহীর আগমন বন্ধ থাকে যা “ফাতরাতুল ওহী ” নামে খ্যাত।[134] ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত অস্থির ও বিচলিত হয়ে মানসিকভাবে কষ্ট অনুভব করেন। তাঁর মানসিক অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা দূরীভূত করে মহান আল্লাহ ওহী নাযিল করেন। এ সময় সূরা মুদ্দাসি্সর এর ১-৭ আয়াত অবতীর্ণ হয়, যার মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

---

[134] “فترة الوحي ” এর সময়কাল কারও কারও নিকট তিন বছর। মূলত: সেটা অল্প কিছু দিন ছিল। [আর রাহীকুল মাখতুম, প্রাগুক্ত, (সম্পাদক)] এ সময়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর পবিত্র কুরআনের অবতরণ বন্ধ ছিল। সময়টি হলো সূরা আলাক ও সূরা আল-মুদ্দাচ্ছির অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যবর্তী সময়। (ইবন হাজর আসকালানী , *ফতহুল বারী*, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.২২)। তারপরও আবার কিছু দিন বন্ধ থাকার পর সূরা দুহা নাযিল হয়। [সম্পাদক]

দা'ওয়াতী কাজে অগ্রবর্তী হয়ে সংশোধন ও সংস্কারের নির্দেশসহ পবিত্রতা অন্যায়-অবিচার হতে বিরত থাকা , অল্পে তুষ্ট থাকা ও যাবতীয় বাধা বিপত্তিতে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[135]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আলোচ্য আয়াত ক'টি অবতীর্ণের মাধ্যমে ইসলামী দা 'ওয়াতের সূচনা হয়। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিগতভাবে এ কাজ শুরু করেন। সে সময় তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তিদের দা 'ওয়াত দেওয়ার টার্গেট নির্ধারণ করেন। স্বীয় পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের নিকট ইসলামের সুমহান দা'ওয়াত উপস্থাপন করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ঐ সকল লোকদের দা 'ওয়াত দিয়েছেন, যাদের চেহারায় সরলতা ও

---

[135] আল্লাহর বাণী,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۝١ قُمْ فَأَنذِرْ ۝٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ۝٥ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۝٦ ﴾ [المدثر: ١، ٦]

"হে বস্ত্রাবৃত ! উঠ এবং সতর্ক কর। তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর। স্বীয় পোশাক পরিচ্ছেদ পবিত্র করুন। অপবিত্রতা হতে দূরে থাক। অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করিও না এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ কর।" সূরা মুদ্দাচ্ছির : ১-৭।

নমনীয়তার ছাপ রয়েছে এবং যারা তাঁকে সত্যবাদী ,
ন্যায়নীতিপরায়ণ ও সৎমানুষ হিসেবে জানে ও শ্রদ্ধা করে।[136]
তাঁর সহধর্মিনী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ওহীর অবতরণ ও
ওয়ারাকা ইবন নওফলের ভবিষ্যতবাণী শুনে তাঁর প্রতি ঈমান
আনয়নের ঘোষণা দেন এবং অত্যন্ত বিচলিত অবস্থায় তিনি রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দৃঢ়তার সাথে সান্ত্বনা দিলেন।
অতপরঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকটতম
ব্যক্তিদের মধ্যে স্বীয় চাচাত ভাই আলী ইবন আবি তালেব ও স্বীয়
গোলাম যায়েদ বিন হারেছাকে দা 'ওয়াত দেন।[137] এভাবে রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে নিজ পরিবারে দা 'ওয়াতের

---

[136] আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপূরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৯০।

[137] যায়েদ ইবন হারেছা এসেছিলেন যুদ্ধে বন্দী হয়ে। পরে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর মালিক হন এবং স্বামীর জন্য তাকে নিয়োজিত করেন। এরপর তার পিতা ও চাচা তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিলেন কিন্তু পিতা ও চাচাকে ছেড়ে তিনি প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে থাকতে পছন্দ করেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভৃত্য যায়েদকে আরব দেশীয় রীতি অনুযায়ী পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। এ ঘটনার পর তিনি যায়েদ ইবন মুহাম্মদ নামে পরিচিত হন। (আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপূরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৯০)।

কাজ করেন। এরা সবাই প্রিয় রাসূলের সততা , সত্যবাদিতা ও মহানুভবতা দেখে ইসলামের সূশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেন। ইতিহাসে তারা "সাবেকীনে আউয়ালীন" নামে পরিচিত।[138] খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজাকে নিয়ে প্রথম দু'রাকাত নামায আদায় করেন। তখন নামায দু'রাকাতই ছিল। পরে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে কাবাগৃহে নামায আদায় করেন।[139]

---

[138] সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে "সাবেকীনে আউয়ালীন" বলে। ইসলামে তাদের মর্যাদা সর্বাধিক। সর্বপ্রথম স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, মহিলাদের মধ্যে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা, আযাদকৃত গোলামদের মধ্যে যায়েদ ইবন হারেছা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং বালকদের মধ্যে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খন্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১)।

[139] আফীফ কিন্দী বলেন, আমি জাহেলী যুগে স্ত্রীর আতর ও কাপড় ক্রয় করার জন্য মক্কায় এসেছিলাম। সেখানে ভোর বেলায় কা'বা শরীফের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ে। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আমার সাথে ছিলেন। এ সময় একজন যুবক আগমন করেন এবং আকাশ পানে তাকিয়ে কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়ান। কিছুক্ষন পর একজন বালক এসে তাঁর ডান পাশে দাঁড়ায়। অতঃপর একজন নারী এসে এদের পিছনে দাঁড়ায়। এরা দু'জন নামায আদায় করে চলে গেলে আমি আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলাম, আব্বাস ঘটনা কি ? তখন আব্বাস বললেন , তুমি কি জান এ যুবক ও

তারপর তাঁর ঘনিষ্ট সুহৃদ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং ইসলাম প্রচারে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন সর্বজনপ্রিয়, নরম মেজায, উত্তম চরিত্র এবং উদার মনের মানুষ। চমৎকার ব্যবহারের কারণে সবসময় তার কাছে মানুষ আসা যাওয়া করতো। এ সময় তিনি সমাজের এমন কিছু ব্যক্তিবর্গকে দা'ওয়াতের জন্য বেছে নিলেন, যাদের উপর তাঁর দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় অনেক লোক ইসলামের অমীয় সুধা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়। তারা হলেন : ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুর রহমান ইবন আউফ, সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস, তালহা ইব ন ওবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ম প্রমুখ। পরবর্তীতে এদের অনেকেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। এরা সংখ্যায় আট জন , তারাই ছিল প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী দল। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

মহিলাটি কে? আমি জবাব দিলাম না। তিনি বললেন যুবকটি হচ্ছে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ। আর বালকটি হচ্ছে আলী। আর এ মহিলা হচ্ছে মুহাম্মদের স্ত্রী। আমার ধারণা সারা দুনিয়ায় এ তিনজন ছাড়া কেউ তাদের দীনের অনুসারী নেই। আফীফ বলেন , এ কথা শুনে আমার মনে হয়েছে, চতুর্থ ব্যক্তি যদি তাদের সাথে আমি হতাম!।

প্রতি ওহী নাযিলে বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তাঁর সাথে নামাজ আদায় করেন। এভাবে বিভিন্ন গোত্রের লোকজন ইসলামের শীতল ছায়ায় দলে দলে যোগদান করতে লাগল। মক্কার সর্বত্র ইসলামের আলোচনা চলতে থাকে এবং ইসলাম ব্যপকতা লাভ করে।[140] গোপন দা ‘ওয়াতে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদের সংখ্যা ছিল ৬০ জন। যার মধ্যে ১২ জন মহিলা ও ১৪ জন গোলাম ছিল।[141] দা‘ওয়াতের এ পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পরিবারকে সর্বপ্রথম তাঁর এ কাজে সহযোগী বানান| ফলে সর্বপ্রথম স্বীয় স্ত্রীর নিকট দা ‘ওয়াত উপস্থাপন করেন। কারণ, নিজের স্ত্রী যদি তার আদর্শের সাথে একমত না থাকে তাহলে এ কাজ যতই ভাল হোক অন্যরা তা গ্রহণ করতে কখনো এগিয়ে আসবে না। মানুষ কোন ব্যক্তিকে তখনই সার্বজনীনভাবে গ্রহণ করে যখন তাকে স্বীয় পরিবার পরিজনের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে দেখে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দা ‘ওয়াতের এ গুরুদায়িত্ব সাময়িক কোন

---

[140] সীরাতে ইবন হিশাম, ১ম খন্ড, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৬২।

[141] ড. আকিল আব্দুহ মিশরী, *তারিখুদ্ দা ‘ওয়াতুল ইসলামীয়্যা*, ১ম সংস্করণ, (সৌদি আরব: মাকতাবা দারুল মদিনা, ১৯৮৭), পৃ. ৮৬।

কাজ ছিল না। বরং এটি ছিল মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব। ফলে পরিবারের সহযোগিতা না থাকলে এ কাজ আঞ্জাম দেয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার ছিল। এ কারণে তিনি প্রথমেই তাঁর স্ত্রীকে এ কাজের সাথী হিসেবে পেলেন। অপরদিকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তাঁর পরিবারের সদস্য ও স্বীয় তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত দশ বৎসর বয়সের এক বালক।[142] আজ হয়ত সে বালক, কিন্তু আগামী দিনে সে হবে যুবক। একটি সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার জন্য যুবকদের ভূমিকা অপরিসীম। কেননা যুবকেরাই সমাজ গড়ে এবং ভাঙ্গে। সুতরাং যুবকেরা যদি প্রথমেই একটি আদর্শের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাহলে তাদের পক্ষে রিসালাতের এ মহান দায়িত্বের বোঝা বহন করা এবং সেটা প্রতিষ্ঠার কাজে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও যাবতীয় কষ্ট মসিবত বরদাশত করা সম্ভব। তাই তিনি এ পর্যায়ে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রথমে টার্গেট নিলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় ক্রীতদাস যায়েদ ইবন হারেছাকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। মূলতঃ সে ছিল তাঁর পরিবারের একজন সদস্য। পরিবারের ভাল-মন্দ সবই তাঁর জানা

[142] ইবনে সাইয়্যেদ আন্ নাস, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৯২।

আছে। তৎকালীন সমাজে দাস-দাসীদের মাধ্যমে মালিকগণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করাতো | অন্যদিকে কোন ব্যক্তি ভাল না মন্দ তার পরিচয় পাওয়া যায় দাসদের নিকট থেকে | অতএব, দাসদের ইসলাম গ্রহণ অত্যধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। তিনি জাহেলী সমাজের চরিত্রবান , প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ইসলামের ছায়াতলে আনতে সক্ষম হন। এভাবে গোপন দা 'ওয়াতে ইসলাম গ্রহণকারী সকল মুসলিম নিজের জান মাল দীনের জন্য উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ থেকে একজন নেতার আনুগত্যের পরাকা ষ্ঠার অধীনে ইসলামের সুমহান আলোকে চারদিকে বিচ্ছুরিত করে দেন। সময় , স্থান, কাল ও পরিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁরা দা'ওয়াত দিয়েছেন। শুধু আবেগের বশবর্তী হয়ে দা 'ওয়াত দিলে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল অত্যাধিক। মক্কায় প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোপন দা 'ওয়াতের পশ্চাতে উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ হলো :

মক্কার কাফেরগণ যাতে এ বিষয়ে অবগত হয়ে প্রথম থেকে দা'ওয়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার সুযোগ না পায়।

গোপন দা 'ওয়াতের মাধ্যমে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন একদল সাহায্যকারী লোক তৈরী অতীব প্রয়োজন ছিল। কেননা , কোন আদর্শই সমাজে বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয় , যতক্ষণ সে আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য একদল সাহায্যকারী ও সমর্থক পাওয়া না যায়।

গোপন দা 'ওয়াতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের জাহেলিয়াতের সকল বন্ধন ও সম্পর্ক ভুলে গিয়ে নতুন ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। যা অতি অল্প সময়ে সম্ভব নয় বরং সুদীর্ঘ সময়ে তিন বছরে এ ধরনের একদল ভ্রাতৃত্ব সম্পন্ন লোক তৈরী হয়েছিল।

গোপনে দা'ওয়াতী কাজ পরিচালনার মাধ্যমে মক্কার সকল গোত্রের নিকট দা'ওয়াত পৌঁছানো সম্ভব হয়েছিল। সমাজের সকল শ্রেণীর ও সকল পর্যায়ের লোকদের অংশগ্রহণ একটি আন্দোলনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এ পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবাগত মুসলিমদেরকে "দারুল আরকামে" প্রশিক্ষণ দিয়ে এমন এক পর্যয়ে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিলেন যারা পরবর্তীতে কুরাইশদের নিষ্ঠুর, নির্মম অত্যাচার-নির্যাতন ও কঠিন অগ্নি পরীক্ষার সময়ও ইসলাম থেকে বিচ্যুত হননি বরং সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় একতাবদ্ধ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য সার্বক্ষণিক নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

প্রকাশ্য দা'ওয়াত

নবুয়তের সূচনালগ্নে সূদীর্ঘ তিন বছর গোপন দা 'ওয়াতের মাধ্যমে যখন একদল লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়ে দীপ্ত কদমে মুষ্টিবদ্ধ হাতে দা 'ওয়াতের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছিল, তখন আল্লাহ তা'য়ালা প্রকাশ্যে এ দা'ওয়াত প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন

﴿ فَٱصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٩٤ ﴾ [الحجر: ٩٤]

“হে নবী আপনাকে যে বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়েছে , তা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিন এবং মুশরিকদের মোটেও পরোয়া করবেন না। ”[143]

কুরআনের অন্যত্র আরো ঘোষিত হয়েছে

﴿ وَأَنذِرۡ عَشِيرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِينَ ٢١٤ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]

“আর আপনি নিজের ঘনিষ্ট আত্নীয়স্বজনকে (আল্লাহর) ভয় প্রদর্শন করুন।[144]

আল্লাহর এই নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণকে এবং বিশেষভাবে নিজের আত্নীয়স্বজনকে আল্লাহর মনোনীত সত্যধর্ম গ্রহণের জন্য প্রকাশ্যে আহবান জনাতে প্র স্তুত হলেন। এক্ষেত্রে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু’টি মাধ্যম গ্রহণ করেন।

ক. ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক স্থাপন

ইসলামী দা ‘ওয়াতের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত যোগাযোগ এর গুরুত্ব আপরিসীম। এর মাধ্যমে পরস্পরের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও

---

[143] আল-কুরআন, সূরা হিজর : ৯৪।

[144] আল-কুরআন, সূরা আশ্-শু’আরা : ১৪।

সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয় । ফলে পরষ্পারিক বিশস্ততা ও ভাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তিগতভাবে এ সম্পর্ক বৃদ্ধির অন্যতম রূপ হলো একত্রে আহার করা । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে এ পদ্ধতির সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্যে দা ‘ওয়াতের নির্দেশ পেয়ে আব্দুল মোত্তালিব পরিবারের লোকদের জন্য একটি ভোজের আয়োজন করলেন , এই ভোজে তাঁর চাচা হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু , আবুতালিব ও আব্বাসের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গও যোগদান করেন। আহারের পর তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তিনি বলেন "হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর! আমি আপনাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের এমন কল্যাণ নিয়ে আগমন করেছি, যা আরবের কোন ব্যক্তি তার স্বজাতির জন্য কোনদিন আনয়ন করেনি। আমি আপনাদেরকে সে কল্যাণের দিকে আহবান জানাচ্ছি। এ কাজে আমার সাথী হবার জন্য কে কে প্রস্তুত ? সত্যের আহবানে আসুন। পথ প্রদর্শক কখনও তার সঙ্গীদের কাছে মিথ্যা বলে না। আল্লাহর শপথ ! যদি সকল লোক মিথ্যা কথা বলে, তবুও আমি আপনাদের নিকট মিথ্যা বলব না, যদি সকল লোক ধোঁকা দেয় , তবুও আমি ধোঁকা দিব

না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে , আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি বিশেষভাবে আপনাদের ও সকল মানুষের নিকট আল্লাহর রাসূল হিসেবে মনোনীত। আল্লাহর শপথ! যেভাবে তোমরা নিদ্রা যাও সেভাবে মৃত্যুবরণ করবে , যেভাবে তোমরা নিদ্রা থেকে উঠ সেভাবে তোমরা কবর থেকে জাগ্রত হবে। তোমরা যে কাজই করো না কেন আল্লাহর কাছে তার অবশ্যই হিসেব দিতে হবে। ভাল কাজের জন্য ভাল পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য মন্দ পুরুস্কার পাবে। মনে রেখ, জান্নাত চিরস্থায়ী, জাহান্নামও চিরস্থায়ী। আল্লাহর শপথ! হে আব্দুল মোত্তালিবের বংশধর , আমি তোমাদের নিকট উত্তম জিনিস নিয়ে এসেছি, আমার জ্ঞাতসারে জাতির মধ্যে কোন যুবক তা নিয়ে আনে নি। আমি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিয়ে এসেছি। এতদশ্রবণে উপস্থিত শ্রোতমন্ডলী সকলে একটু নরম সুরে কথা বলতে লাগল। আবু তালেব তাঁকে সাহায্য ও হেফাজত করার প্রতিশ্রুতি দিল । কিন্তু আব্দুল মোত্তালিব (পূর্ব পুরুষদের) ধর্ম ত্যাগের পক্ষপাতি নয়। আর আবু লাহাব বলল , চলো সে আমাদের ধবংস করে দিবে"।[145]

---

[145] ড. আহমদ গালুশ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩১৫।

খ. সংক্ষিপ্ত জনসভা

জনসভার মাধ্যমে সমবেত অসংখ্য মানুষের নিকট ইসলামের সুমহান আদর্শ সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা সহজ হয়। অতএব ,
দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে জনসভার গুরুত্ব অত্যাধিক। জনসভায় প্রাঞ্জলময় ভাষার বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয় এবং মানুষের হৃদয়ে সত্য গ্রহণের সহজাত প্রবৃত্তিকে কার্যকর করা যায়। ফলে কোন কোন ভাষণ জাদুর ন্যায় প্রভাব ফেলে থাকে। প্রকাশ্যে দা 'ওয়াতের এ পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পদ্ধতিটিকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত হিম্মত ও সাহস সঞ্চার করে নতুন সম্ভাব্য সংঘাতময় পরিস্থিতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে একদিন সাফা পাহাড়ের উপর উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি আরবের বিশেষ রীতি অনুযায়ী কুরাইশ জনতাকে ডাক দিলেন। তৎকালীন সময়ে কোন বিপদের মূহুর্তে জনগণকে সাহায্যের জন্য একটা বিশেষ সাংকেতিক ধ্বণি দিয়ে ডাকার রেওয়াজ ছিল। আর তা হল, يا صباحاه "হে প্রভাত কালের বিপদ!" তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে পদ্ধতি আবলম্বন করে আরবদের বিভিন্ন

গোত্রের নাম ধরে (ওহে ফিহরের বংশধর, ওহে আদীর বংশধর!) বলে ডাক দিলেন। অতঃপর কুরাইশ গোত্র ও আবু লাহাব সহ বিরাট জনতার দল ছুটে এলো। সবাই রুদ্ধশ্বাসে কান পেতে রইল কী হয়েছে জানার জন্যে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমেই উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করলেন,

«أ رايتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أ كنتم مصدقي قالوا ما جرينا عليكم كذبا قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» .

"আমি যদি বলি যে , ও পাহাড়ের অপর পাশে এক বিরাট শত্রু বাহিনী তোমাদের উপর আক্রমণের অপক্ষায় রয়েছে। তারা এখনই তোমাদের উপর আক্রমণ করবে। তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?"[146] সবাই সমবেত স্বরে বলে উঠলো : হ্যাঁ, কেন করব না ? আমাদের জনামতে তুমি কখনো মিথ্যা কথা বলনি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাহলে শোন! আমি বলছি তোমরা এক আল্লাহকে প্রভু ও উপাস্য মেনে নাও নচেৎ তোমাদের উপর কঠিন আযাব নেমে আসবে।

---

[146] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, ২য় খন্ড, প্র. ৭০২ ও ৭৪৩, ইমাম মুসলিম , *প্রাগুক্ত*, ২য় খন্ড, পৃ. ১১৪।

এভাবে তিনি অতি সংক্ষেপে প্রথমবারের মত উ ন্মুক্তভাবে দা'ওয়াত পেশ করলেন। তাঁর চাচা আবু লাহাব কথাটা শুনা মাত্রই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বললো "ওরে হতভাগা ! তুই আজকের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যা। এ কথা বলার জন্যই কি আমাদের এখানে ডেকেছিলি। ফলে আবু লাহাব অন্যান্য নেতৃস্থানীয় লোকেরা খুবই ক্ষুদ্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেল।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দা 'ওয়াতের প্রথম পর্যায়ে নিকটাত্মীয়দের ও নিজবংশীয় লোকদের মাঝে এ মহান আ হ্বান পৌঁছাতে সচেষ্ট ছিলেন। কেননা, নিকটতর লোকজনের সাথে দা 'ঈকে সবসমময় পারিবারিক ও সামাজিকভাবে চলাফেরা করতে হয়। এমনকি বিভিন্ন বিপদ-আপদে তারা সর্বদা পাশে থাকে। কোন ব্যক্তির ভাল-মন্দের সাক্ষ্য স্বীয় বংশের লোকদের দ্বারাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং নিজ বংশীয় লোকজন যদি কোন ব্যক্তির আদর্শের প্রতি একাত্মতা পোষণ করে তাহলে সে আদর্শ বাস্তবায়ন করা অনেক সহজ হয় । আর যদি বংশের লোকেরা প্রথম বিরোধী ভুমিকায় অবতীর্ণ হয় , তাহেল বহিরাগত

লোকদের সে আদর্শ গ্রহণের প্রতি চরম অনীহা সৃষ্টি হয়। অতএব, যে কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিজ বংশের লোকদের সর্বপ্রথম সে আদর্শে অনুপ্রাণিত করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ দা'ঈ। তিনি অত্যন্ত হিকমতপূর্ণ পন্থায় ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৎকালীন আরবের বর্বর ও জাহেলী সমাজে ইসলামী দা 'ওয়াত উপস্থাপন করেছেন। তার দা 'ওয়াত ছিল অত্যন্ত ব্যাপক , যা মানুষের ব্যক্তিগত জীবন , পারিবারিক জীবন , সামাজিক জীবন , রাষ্ট্রীয় জীবন, এমনকি আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত পরিব্যপ্ত। ধনী-দরিদ্র, মুসলিম-অমুসলিম, সাদা-কালো, কাফির-মুশরিক, নারী-পুরুষ, রাজা-প্রজা, সকলেই তাঁর দা 'ওয়াতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পবিত্র কুরআনের আলোকে বিশেষতঃ সূরা ত্বা-হা ও আল-কাসাসে বর্ণিত তাঁর দা'ওয়াত পদ্ধতি নিম্নরূপ :

এক. আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহবান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে সর্বপ্রথম আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানান। এক আল্লাহর আহবান মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করে। রাজা-প্রজা, ধনী-

দরিদ্র, সাদা-কালোর ভেদাভেদ ভূলে গিয়ে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। আল্লাহ এক , অদ্বিতীয়, তাঁর সাথে কোন শরীক নেই। তিনি চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্ব বিষয়ে তিনি অধিক জ্ঞাত, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অাঁধার। তাঁর ইশারায় রাত-দিন আবর্তিত হয়। আলোকিত হয় সারা বিশ্বময় , আকাশ ও জমীনের মধ্যবর্তী সমুদয় কিছুর তিনিই স্রষ্টা। [147] তিনি

---

[147] এ মর্মে পবিত্র কুরআনের সূরা ত্বা-হায় এসেছে,

﴿ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا وَمَا تَحۡتَ ٱلثَّرَىٰ ۝٦ وَإِن تَجۡهَرۡ بِٱلۡقَوۡلِ فَإِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخۡفَى ۝٧ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ لَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ ۝٨ ﴾ [طه: ٦، ٨]

“আর আসমান সমূহ ও যমীনের উপর অবস্থিত যাবতীয় বস্তু এবং যা কিছু তার মাঝে ও মাটির নীচে অবস্থিত সব কিছুর মালিক তিনিই। তুমি উচ্চ কণ্ঠে যা বল তা সহ তিনি যাবতীয় গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই জানেন। আল্লাহ , তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তাঁর অনেক উত্তম নাম রয়েছে। ” সূরা ত্বা-হা : ৬-৮।

সূরা আল-কাসাসে এসেছে ,

﴿ وَرَبُّكَ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخۡتَارُۗ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ۝٦٨ وَرَبُّكَ يَعۡلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمۡ وَمَا يُعۡلِنُونَ ۝٦٩ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ لَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلۡأُولَىٰ وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَلَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ۝٧٠ ﴾ [القصص: ٦٨، ٧٠]

“আপনার পালনকর্তা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন। তাদের কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি

এসব কিছু সৃষ্টি করে আমাদের উপর বিশাল অনুগ্রহ করেছেন। মানুষের প্রত্যাবর্তনস্থল মূলতঃ তাঁরই দিকে। এসব বিষয়ের সমুদয় জ্ঞান লাভের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎকালীন সমজের মানুষকে আহবান জানিয়েছিলেন। যেহেতু তারা তখন আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করত , গাছ-পালা, তরু-লতা, মুর্তি-দেবতা, পাথর প্রভৃতির পূজায় তারা নিজেদের নিয়োজিত করত। আদি যুগে উত্তর ও দক্ষিন আরবের মরু ও পাহাড়ী অঞ্চলে এরূপ বস্তু পূজার নানা প্রকার নিদর্শন প্রত্নতত্ত্ববিদরা উদঘাটন করেছেন। ফিলিপ হিট্রির মতে , মস্তবড় এরূপ অন্ধবিশ্বাস ভিত্তিক ধর্মীয় অনুভূতি মরুদ্যানের অধিবাসীদেরকে কল্যাণকর দেব-দেবী পূজায় ও তীর্থস্থান পূজায় নিবিষ্ট করে। [148] মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাওহীদবাণী তাদের এসব বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে। আল্লাহর অনুপম সৃষ্টি ও অসংখ্য নিয়ামতরাজি নিয়ে একটু ভেবে দেখার জন্য তিনি স্বজাতিকে উদাত্ত আহবান জানান। এ মর্মে

উর্দ্ধে। তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে আপনার পালনকর্তা তা জানেন।" সূরা আল-কাসাস : ৬৮-৭০।

[148] P.K Hitti, *History of The Arabs*, opcit, p-97.

পবিত্র কুরআনে এসেছে,

﴿ قُلۡ أَرَءَيۡتُمۡ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمُ ٱلَّيۡلَ سَرۡمَدًا إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ مَنۡ إِلَٰهٌ غَيۡرُ ٱللَّهِ يَأۡتِيكُم بِضِيَآءٍۚ أَفَلَا تَسۡمَعُونَ ٧١ قُلۡ أَرَءَيۡتُمۡ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرۡمَدًا إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ مَنۡ إِلَٰهٌ غَيۡرُ ٱللَّهِ يَأۡتِيكُم بِلَيۡلٍ تَسۡكُنُونَ فِيهِۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ ٧٢ وَمِن رَّحۡمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسۡكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِۦ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٧٣ ﴾ [القصص: ٧١، ٧٣]

“হে রাসূল ! আপনি বলে দিন , ভেবে দেখ তো , আল্লাহ যদি রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন , তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে , যে তোমাদেরকে আলোকদান করতে পারে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না ? আর আল্লাহ যদি দীনকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে , তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে যে তোমাদেরকে রাত্রিদান করতে পারে , যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে, তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না ? তিনি স্বীয় করুনায় তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন , যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ কর ও তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষন কর

এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।”[149] এভাবে তিনি আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে তাদের উপাস্যদের সাথে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন। কিন্তু তথাপিও তারা অনুধাবন করতে সক্ষম হল না। পরকাল দিবসে তাদের উপাস্যদের কাছ থেকে প্রমাণ চাওয়া হবে। তখনই তারা তা বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারবে, অথচ সেদিনের তাদের অনুভুতি কোন্‌ কাজে আসবে।[150]

যুগে যুগে সকল নবী-রাসূল তাদের স্বজাতিকে সর্বপ্রথম এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও শির্কের অপনোদনের প্রতিই

---

[149] আল-কুরআন, সূরা আল-কাসাস : ৭১-৭৩।

[150] আল্লাহ বলেন,

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ فَعَلِمُوٓا۟ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾ ﴾ [القصص: ٧٤، ٧٥]

“সে দিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার সাথে শরীক মনে করতে তারা কোথায়? প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি একজন সাক্ষ্য আলাদা করব; অতঃপর বলব, তোমাদের প্রমান আন। তখন তারা জানতে পারবে যে, সত্য আল্লাহর এবং তারা যা গড়ত তা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে।” আল-কুরআন, সূরা কাসাস : ৭৪-৭৫।

আহবান জানিয়েছেন। নূহ , হুদ ও ছালেহ আলাইহিস সালাম সকলেই এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি নিজ নিজ সম্প্রদায়কে দা'ওয়াত দিয়েছেন এবং অন্যান্য ইলাহদের অস্বীকার করার প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে এসেছে,

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥ ﴾ [الانبياء: ٢٥]

"আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশ দিয়ে প্রেরণ করেছি যে. আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর।"[151]

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর অসংখ্য নি 'আমত প্রাপ্ত হয়। তদুপরি গর্ব-অহংকারবশতঃ আল্লাহর নির্দেশমত জীবন পরিচালনা হতে বিরত থাকে। এ জন্যে মহান আল্লাহ তাদের উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মাধ্যম হিসেবে কতিপয় ইবাদত ফরয করে দিয়েছেন, যেন বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়।

---

[151] আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া : ২৫।

আর সেই নির্দেশগুলো যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে জনসাধারনের নিকট পৌঁছে দেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদতে রত থাকতেন এবং পাশাপাশি স্বীয় পরিবার-পরিজনকে সে ইবাদতের প্রতি আহবান জনাতেন। এ ক্ষেত্রে সালাতের গুরুত্ব সর্বাধিক। যুগে যুগে প্রেরিত সকল নবী-রাসূলের উপরই তা ফরয ছিল। কেননা , এর মাধ্যমে আল্লাহর সপ্রশংস মহিমা বর্ণনা করা যায় এবং পুরোপুরি তার কাছে মাথানত করে আত্মসমর্পণ করা সম্ভব হয়। এ দিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন "হে নবী! তুমি তোমার পরিবার পরিজনকে নামাজের আদেশ দাও এবং নিজের উপর অবিচল থাকুন।"[152]

ইসলাম শুধুমাত্র ব্যক্তির সংশোধনই কামনা করে না। ব্যক্তির পাশাপাশি স্বীয় পরিবার , সমাজ প্রভৃতির সংশোধনও নিশ্চিত করে। আর সেজন্যে প্রয়োজন নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের ইসলামের অনুশীলন, যার মাধ্যমে একটি ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ হওয়া সম্ভব। পরিবার ও সমাজের পরিবেশ ভিন্নরূপ হলে কোন

---

[152] আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা : ১৩২।

ব্যক্তির পক্ষে ইসলামের পূর্ণ অনুশীলন অসম্ভব। অতএব , ব্যক্তির নামাযসহ যাবতীয় বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি হলো আপন আপন পরিবার। এজন্যে মহান আল্লাহ তাঁকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তা বাস্তবায়ন করে গেছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম পরিবারের নিকট এ বিষয়ে দা 'ওয়াত উপস্থান করেছিলেন। ইমাম কুরতুবী বলেন , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেহ ফজরের নামাযের সময় আলী ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গৃহে গমন করে الصلاة، الصلاة বলতেন।[153]

দুই. ভয়ভীতি প্রদর্শন

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে نذير (ভীতি প্রদর্শক) রূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বজাতিকে আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তির ভয় প্রদর্শন করতেন। ভয়ভীতি মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করে।

---

[153] ইমাম কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ. ২৫৬।

যখন মানুষ ভয়হীন হয়ে এ পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করে তখন তার দ্বারা যে কোন ধরনের অন্যায় হতে বিরত থাকতে পারে এবং সরল সঠিক পথের দিশা পায়। সেজন্যে আল্লাহ তা 'আলা যুগে যুগে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে তাদের অনুভূতিকে জাগ্রত করেছেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে স্বয়ং একজন প্রকাশ্য ভীতিপ্রদর্শকরূপে স্বজাতির কাছে পেশ করেছেন। এ মর্মে তিনি ওহী লাভের প্রাক্কালে আল্লাহর পক্ষ হতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন- قُمْ فَانْذِرْ "হে নবী ! আপনি উঠুন এবং সতর্ক করুন।" ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জাতিকে জাহান্নামের কঠিন আযাব সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন করে দিয়েছেন। সহীহ মুসলিম শরীফে এ মর্মে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে , যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর

﴿ وَأَنذِرۡ عَشِيرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]

আয়াতখানি নাযিল হয় , তখন তিনি কুরাইশদের সকল গোত্রকে একত্রিত করে প্রত্যেক গোত্রের নাম ধরে বলতে লাগলেন, হে বনী কা'ব বিন লুয়াই তোমরা তোমাদের নিজেদের জাহান্নামের আগুন

থেকে রক্ষা কর। এভাবে তিনি মুররাহ বিন কা 'ব, আবদে শামস, আবদে মানাফ , হাশেম, বনী আব্দুল মোত্তালিবের বংশধরকে সমভাবে আহবান জানান। এমনকি স্বীয় কন্যা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কেও একই সম্বোধন করেন এবং পরকালে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রক্তের সম্পর্কের হওয়া সত্বেও কোন কাজে আসবে না মর্মে তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলেন।[154] ফলে একথা সহজেই অনুমেয় যে , ভয়-ভীতি প্রদর্শন দা 'ওয়াতের অন্যতম একটি মাধ্যম। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ এ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ঐ সকল ভয়-ভীতি সম্পন্ন লোকদের জন্যই উপদেশস্বরূপ। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন

﴿ طه ۝١ مَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِتَشۡقَىٰٓ ۝٢ إِلَّا تَذۡكِرَةٗ لِّمَن يَخۡشَىٰ ۝٣ ﴾

[طه: ١، ٣]

"হে আমার প্রিয় বন্ধূ ! আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্য আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি , কিন্তু এটা তাদেরই

[154] ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, ১ম খন্ড, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ৩০৩।

উপদেশের জন্য যারা ভয় করে।”[155]

এ ছাড়াও এ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মানব জাতির জন্য অসংখ্য সতর্কবানী উচ্চারিত হয়েছে যেন, মানবজাতি উপদেশ গ্রহণ করে এবং নিজেদের অনুভূতি জাগ্রত রাখে।[156]

তিন. আখেরাতের জীবনকে অগ্রাধিকার দান

দুনিয়ার এ জীবন অত্যন্ত ক্ষনস্থায়ী। এখানে মানুষ যদি ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে যায়, তাহলে পরকালীন জীবনে এর চরম মূল্য দিতে হবে। দুনিয়ার প্রতি আসক্তি মানুষকে অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন ও যাবতীয় অবৈধ পথে পা বাড়াতে সহায়তা করে। অপরদিকে আখেরাতের চিন্তা মানুষের মাঝে আল্লাহ প্রেম, আল্লাহ্‌ভীতি, সৎকর্ম ইত্যাদি কাজে উৎসাহ যোগায়, পবিত্র কুরআনে পার্থিব জীবনকে খেল-তামাসার বস্তু হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তদুপরি মানুষ এর পিছনে পাগলপারা হয়ে ছুটছে;

---

[155] আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা : ১-৩।

[156] এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَانًا عَرَبِيّٗا وَصَرَّفۡنَا فِيهِ مِنَ ٱلۡوَعِيدِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ أَوۡ يُحۡدِثُ لَهُمۡ ذِكۡرٗا ١١٣ ﴾ [طه: ١١٣]

আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা : ১১৩।

লাগামহীন জীবন যাপন করছে এবং সীমাহীন ভোগে বিভোর হয়ে পড়ছে। মুমিনের জন্য এ পার্থিব জীবন শুধুমাত্র পরীক্ষার বস্তু বৈ কিছুই নয়। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে আখেরাতের জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে দুনিয়ার জীবনে প্রস্তুতিমূলক নেক আমল সম্পন্ন করার প্রতি আহবান জানান। কেননা, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস মানুষকে দৃঢ়ভাবে আল্লাহর পথে চলতে সাহায্য করে। অন্যথায় যে কোন সময় তাগুতের প্ররোচণায় প্রতারিত হতে পারে। এ মর্মে আল্লাহ তা 'আলা তাঁর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ١٣١ ﴾ [طه: ١٣١]

“আমি তাদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেসব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেয়া রিযক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।”[157]

---

[157] আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা : ১৩১।

অতএব, মানুষের ভোগের সামগ্রী নগন্য ও ক্ষণস্থায়ী , আর আল্লাহর নিকট যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। এ মর্মে সূরা আল-কাসাসে এসেছে,

﴿ وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيۡءٖ فَمَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتُهَاۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ٦٠ ﴾ [القصص: ٦٠]

“তোমাদের যা কিছু দেয়া হয়েছে তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা এবং আল্লাহর নিকট যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না ?”[158]

দুনিয়ার প্রতি অত্যাধিক আসক্তি , মহববত ও ঝোঁকপ্রবণতা মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এ কার ণে অতীতে অনেক জাতিকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এসেছে,

﴿وَكَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةِۢ بَطِرَتۡ مَعِيشَتَهَاۖ فَتِلۡكَ مَسَٰكِنُهُمۡ لَمۡ تُسۡكَن مِّنۢ بَعۡدِهِمۡ إِلَّا قَلِيلٗاۖ وَكُنَّا نَحۡنُ ٱلۡوَٰرِثِينَ ٥٨ ﴾ [القصص: ٥٨]

---

[158] আল-কুরআন, সূরা আল-কাসাস : ৬০।

“আমি কত জনপদকে ধ্বংস করেছি যার অধিবাসীরা ভোগ সম্পদের দম্ভ করত। ধ্বংসের পর খুব কম লোকই এ গুলোতে বাস করত। আর আমি চুড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।”[159]

তৎকালীন আরবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দা ‘ওয়াতের এ মহান মিশন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার জন্য পার্থিব বিভিন্ন প্রকার ভোগ-বিলাস সামগ্রীর প্রলোভন দেখায়। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রতি অগাধ আস্থা ও আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখের প্রত্যাশায় তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ মর্মে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

«والله لو وضعوا الشمس عن يميني و القمر عن يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه، ما تركته» .

“আল্লাহর শপথ ! তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চাঁদ এনে দিয়ে চাইত যে , আমি এ কাজ পরিত্যাগ করি , তথাপি আমি তা পাত্যিাগ করতাম না , যতক্ষন না আল্লাহ এ কাজকে

---

[159] আল-কুরআন, সূরা আল-কাসাস : ৫৮।

সফল ও জয়যুক্ত করেন অথবা আমি এ কাজ করতে করতে শহীদ হয়ে যাই।”[160]

অতএব, আখেরাতের চিন্তাই মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিতে সক্ষম হয়, যা মূলতঃ একজন মানুষের চুড়ান্ত সফলতার মনজিল। পরকালীন জীবনকে অগ্রাধিকার না দেয়ার জন্যে আল্লাহ তা ‘আলা অসংখ্য জনপদকে ধ্বংস করেছেন , তারা আল্লাহ প্রদত্ত নি ‘আমত লাভের পরও তার প্রতি অকৃতজ্ঞ ছিল। দা‘ওয়াতের প্রাথমিক যুগে এ মর্মে মক্কাবাসীকে সাবধান কল্লে মহান আল্লাহ বলেন- “হে মক্কাবাসীগণ! তোমরা যে ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে অবাধ্য হয়েছ এবং তার (রাসূলে র) সাথে বিরোধ করছো তোমাদের ন্যায় বহু জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি , যারা স্বীয় ভোগ-বিলাসের বস্তুতে গর্বিত ছিল এবং তারা আমার (আল্লাহ) প্রদত্ব নি ’আমতের প্রতি অকৃতজ্ঞ ছিল।”[161]

চার. মাদ’ঊদের ব্যাপারে হেদায়েত লাভের প্রত্যাশী হওয়া

---

[160] সীরাতে ইবনে হিশাম, *প্রাগুক্ত,* ১ম খন্ড, পৃ. ১৬৬।

[161] ইবন কাছীর, *তাফসীরে ইবন কাছীর*, প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ. ৪০৭।

দা‘ঈ যে বিষয়ে মানুষকে আহবান করেছে তার প্রতি অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হবে। দা ‘ওয়াত দানের পর এটি গ্রহণীয় হওয়া বা অগ্রাহ্য হওয়ার বিষয়ে তাড়াহুড়া না করে ধীরস্থিরভাবে নিয়মিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয়। এ ক্ষেত্রে হতাশা অনুভব করা যাবে না। কেননা দা ‘ঈর কাজ হলো মানুষের নিকট ইসলামের সুমহান আদর্শকে পৌঁছে দেয়া আর তা মানুষের নিকট গ্রহণীয় করে তোলার দায়িত্ব হল আল্লাহর | হেদায়াতের চাবিকাঠি তাঁরই হাতে ; তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাচা আবু তালেবের তত্বাবধানে সুদীর্ঘ বছর দা ‘ওয়াতের মহান কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। কিন্তু চাচাকে নিজ ধর্মের অনুসারী করতে পারেন নি। আবু তালেব যখন মৃত্যু শয্যায় তখনও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলে ইমান আনার আহবান জানান। কিন্তু তিনি আবু জাহল , মুগীরাসহ তার বংশীয় লোকদের চাপে আব্দুল মোত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করেনি। [162] তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাচার জন্য প্রার্থনা করতে চেয়েছিলেন।

---

[162] *প্রাগুক্ত।*

কিন্তু আল্লাহ তা 'আলা তাঁকে নিষেধ করলেন এবং ঘোষণা করলেন,

﴿ إِنَّكَ لَا تَهۡدِي مَنۡ أَحۡبَبۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ٥٦ ﴾ [القصص: ٥٦]

"হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হবেন না বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত দান করেন। তিনি হেদায়েতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।"[163]

ইসলামের বিজয়ের জন্য হতাশা অনুভব না করে প্রত্যাশিত হওয়া একান্ত বাঞ্চনীয়। মুমিনগণ অবশ্যই বিজিত হবে। তবে বিজয়ের জন্য আল্লাহর একটি নির্ধারিত নিয়ম রয়েছে , আর সেটি হলো আল্লাহর প্রতি পূর্ণআস্থা ও বিশ্বস্ত মুমিন হওয়া। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ١٣٩ ﴾ [ال عمران: ١٣٩]

---

[163] আল-কুরআন, সূরা আল-কাসাস : ৫৬।

“তোমরা ভয় করনা , চিন্তিতও হয়োনা, তোমরা বিজয়ী হবে যদি তোমরা মু’মিন হতে পার।” [164]

পাঁচ. মাদ‘উদের জন্য দু‘আ করা

যাদেরকে দা‘ওয়াত দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে দা ‘ওয়াত ফলপ্রসু হয়ে থাকে। যেহেতু হেদায়াত করার মালিক একমাত্র আল্লাহ সেহেতু আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশী হওয়া দা ‘ঈর একান্ত কর্তব্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে এ গুণটির সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টার্গেট করে প্রভাবশালী লোকদের বাছাই করে দা ‘ওয়াত দিতেন এবং এ বিষয়ে মহান আল্লাহর সাহায্য প্রত্যাশা করতেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম গ্রহণের জন্য তিনি আল্লাহর নিকট প্রর্থনা করেছিলেন। হাদীসে এসেছেঃ

«اللّٰهُمَّ اعز الإسلام باحب هذين الرجلين اليك بابي جهل أو بعمر بن الخطاب قال و كان احبهما اليه عمر».

---

[164] আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান : ১৩৯।

“তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন , হে আল্লাহ! তুমি দু’জন প্রিয় ব্যক্তিকে ইসলামের মর্যাদা দান কর। তারা হলেন , আবু জাহল অথবা উমর ইবনুল খাত্তাব। বর্ণনাকারী বলেন , উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে বেশী প্রিয় ছিলেন।”[165]

অতঃপর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের ছায়াতলে আসেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই প্রকাশ্য ভাবে ইসলামের দা‘ওয়াত শুরু হয়। মুসলিমগণ প্রকাশ্যে “বায়তুল্লাহ” গিয়ে নামায আদায় করে।[166]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো রাগ হয়ে এবং বিরক্তবোধ করে মাদ ‘ঊদের বদ -দু‘আ দেননি। দরদভরা মন নিয়ে, ভালবাসা দিয়ে আল্লাহর নিকট তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। ওহুদের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দান্দান মোবারক শহীদ করা হয়। মাথায় তীরের আঘাতে তিনি আহত হন। তদুপরি তিনি তাদের জন্য কল্যাণের দু ‘আ করেছিলেন,

---

[165] ইমাম তিরমিযী, *প্রাগুক্ত,* কিতাবুল মানাকিব, হাদীস নং- ৩৬১৪।

[166] আত্ তাবারী, *কাসাসুল আম্বিয়া,* প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩২৯।

« اللَّهُمَّ اغفر لقومي فانهم لا يعلمون»

“হে আল্লাহ! তুমি আমার জাতিকে ক্ষমা কর , তারা বুঝতে পারেনি।”[167]

ছয়. বিনয় ও নম্রভাবে দাওয়াত উপস্থাপন

বিনয় ও নম্রতা এমন একটি গুণ , যার মাধ্যমে অন্যের নিকট খুব সহজেই গ্রহণযোগ্য হিসেবে দা‘ঈ নিজের স্থান করে নিতে পারে। ইসলামী দা‘ওয়াতের ক্ষেত্রে এর ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। বিনয় একজন দা‘ঈর চারিত্রিক ভূষণ। বিনয়ের মাধ্যমে দা ‘ঈ মানুষের নিকটবর্তী হয়ে যায় , ফলে দা‘ওয়াত উপস্থাপন সহজ হয় এবং সমাজের সকল শ্রেণীর লোক তা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

﴿ فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]

---

[167] ড. রউফ শালবী, *আদ-দা‘ওয়াতুল ইসলামিয়্যাহ ফী আহদিল মক্কী*, (জামেয়া কাতার: ১২০২হি.), পৃ. ১৭৩।

“আপনি আল্লাহর করুণায় সিক্ত হয়ে তাদের প্রতি দয়াপাবশ না হয়ে যদি কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হতেন , তাহলে আপনার কাছ থেকে লোকজন দূরে সরে যেত। অতএব , আপনি তাদের ক্ষমা করুন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রর্থনা করুন এবং যাবতীয় কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ভরসাকারীদের পছন্দ করেন।”[168]

বিনয়ের মুর্ত প্রতীক হচ্ছেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ। বিনয় ও নম্রতা দ্বারাই তাঁরা মানুষকে আপন করে নিয়েছেন। বিনয়ী ব্যক্তিকে আল্লাহ যেমন ভালবাসেন মানুষও তাকে পছন্দ করে। সকল মু 'মিনদের প্রতি বিনয়ী হবার ব্যাপারে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছিলেন। [169] এ মর্মে হাদীসে এসেছে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন , “আল্লাহ

---

[168] আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান : ১৫৯।

[169] আল্লাহ বলেন,

﴿ وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢١٥ ﴾ [الشعراء: ٢١٥]

“যারা তোমার অনুসরন করে সে সকল বিশ্বাসীদের প্রতি বিনয়ী হও। ” আল-কুরআন, সূরা আশ্ শু‘আরা : ২১৫।

আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন এ মর্মে যে , তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে বিনয় নম্রতার আচরণ কর , যাতে কেউ কারো উপর গর্ব ও গৌরব না করে এবং পরস্পর পরস্পরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে।[170] বিনয় ও নম্রতার প্রভাবে আরবের এক বেদুঈন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তার জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নম্র ব্যবহার লংঘিত হয়নি। এ মর্মে হাদীসে এসেছে,

"এক বেদুঈন মসজিদে নববীতে এসে প্রস্রাব করতে শুরু করে। এ দেখে সহাবায়ে কেরাম তাকে ধমকাতে লাগলেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বারণ করে তাকে প্রস্রাব শেষ করার সুযোগ দিলেন। আর বালতি এনে পানি ঢেলে পরিস্কার করান। অতঃপর লোকটিকে ডেকে নরম ভাবে বলেন , "দেখ এটা মসজিদ , ইবাদতের স্থান। এখানে প্রস্রাব করা ঠিক

---

[170] হাদীসটি হচ্ছে,

عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله اوحي الي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد علي احد و لا يبغي أحد على أحد» (مسلم)

ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, ১ম খন্ড, কিতাবুল অযু, পৃ. ৩২২।

না। তখন লোকটি তার নিজের ভুল বুঝতে পারল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথায় এতই প্রভাবিত হয় যে , প্রায়ই সে দু ’আ করত , হে আল্লাহ! একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আমাকে দয়া কর, অন্য কাউকে নয়।[171]

সাত. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

ইসলামী দা ‘ওয়াতকে মানুষের মাঝে সহজবোধ্য করে তোলার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন ত ন্মধ্যে আলোচ্য পদ্ধতিটি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবী রাখে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের নিকট সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আহবান জানাতেন। সেক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ইবাদত বন্দেগীর দিকে দা ‘ওয়াত দিতেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী প্রাপ্ত হবার পর তিনি নামাযের বিষয়ে খুব গুরুত্ব দেন। মি‘রাজ রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই তিনি সকাল এবং রাত্রে দু ’রাকআত করে নামায আদায় করতেন।[172]

---

171 ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত,* কিতাবুল ওযু, হাদীস নং ২১৩।

172 ইবন হাজার আসকালানী, *প্রাগুক্ত,* ২য় খন্ড, পৃ. ৩৬৯।

নবুওয়তের সূচনাতেও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আন হা-কে সাথে নিয়ে নামায আদায় করেছেন।[173] পরিবার-পরিজনদের নামাযের ব্যাপারে খুব তাগিদ দিতেন।[174] তাঁর মক্কী জীবনের দা 'ওয়াতী কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে খুব সহজেই অনুমেয় হয় যে , তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ইবাদত ও আখলাকের গুরুত্ব না দিয়ে আকীদা ও বিশ্বাসের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং শির্কমুক্ত স্বচ্ছ আকীদার প্রতি মানুষকে আহবান করেছেন। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ফরয ইবাদতসহ শরীয়তের আনুষাঙ্গিক আহকাম সমূহ পালনের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বিভিন্ন এলাকায় প্রেরিত দা 'ঈদের এ মর্মে নির্দেশ দিতেন। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ও প্রমাণ আমরা মু 'আয ইবন জাবালের বর্ণিত হাদীসে দেখতে পাই। আব্দুল্লাহ ইবন আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত , নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু 'আয রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ইয়ামেনের শাসনকর্তারূপে প্রেরণ করার সময় এ মর্মে উপদেশ দেন যে, "হে

---

[173] ইবন কাছীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,* ৪র্থ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

[174] ﴿ وَأۡمُرۡ أَهۡلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَاۖ لَا نَسۡـَٔلُكَ رِزۡقٗاۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكَۗ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلتَّقۡوَىٰ ١٣٢ ﴾ [طه: ١٣٢] আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা : ১৩২।

মু‘আয! তুমি এমন স্থানে যাচ্ছ , যার অধিবাসীরা হল আহলে কিতাব। (ইয়াহূদী ও খৃষ্টান)। সুতরাং তুমি তাদেরকে সর্বপ্রথম (আল্লাহর দীনের দিকে) এভাবে দা ‘ওয়াত দিবে যে , তারা সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন হক মা‘বুদ নাই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। যদি তারা একথা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে বলবে যে , আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যতি তারা এটাও মেনে নেয় , তাহলে তাদের জানিয়ে দিবে যে , আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন , যা ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হবে। যদি তারা এটা মেনে নেয় , তাহলে সাবধান! তাদের সর্বোত্তম মাল (যাকাত হিসেবে) গ্রহণ করবে না। আর মজলুমের বদ দু ‘আকে অবশ্যই ভয় করবে। কেননা , মজলুমের বা নিপীড়িত লোকের প্রার্থনা ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না। (অর্থাৎ মজলুমের দু ‘আ আল্লাহ কবুল করেন)।[175]

---

[175] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, কিতাবুয যাকাত, পৃ. ২৫৬।

উক্ত হাদীসে দা 'ওয়াতের বিষয়গুলোকে গুরুত্বের দিক বিবেচনায় এনে পর্যায়ক্রমিক সাজানো হয়েছে। প্রথমতঃ তাওহীদ ও আকীদা, দ্বিতীয়তঃ ইবাদাত, তৃতীয়তঃ মানুষের পারস্পারিক হক চতুর্থতঃ পারস্পারিক মু'আমেলাত।

আট. তাকওয়া অবলম্বনের প্রতি আহবান

তাকওয়া হল উত্তম চারিত্রিক ভূষণ , যা একজন দা 'ঈর জীবনে প্রতিফলিত হওয়া অত্যাবশ্যক। তাকওয়া মানুষকে যাবতীয় অন্যায়-অবিচার, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, প্রভৃতি হতে রক্ষা করে সৎকর্ম সম্পাদনে সাহায্য করে। এ গুণে গুনান্বিত দা 'ঈর প্রভাব মাদ'উদের উপর খুব সহজেই পড়ে। যুগে যুগে পৃথিবীতে প্রেরীত সকল নবী-রাসূল মানুষকে এ গুণের অধিকারী হওয়ার আহবান জানিয়েছেন। তাকওয়া ঢাল স্বরূপ , যা মানুষকে পাপকাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নাযিলকৃত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মুত্তাকীদের জন্যই হেদায়েতবর্তিকা। এ মহাগ্রন্থ থেকে তারাই উপদেশ গ্রহণ করে। অতএব , কুরআন অবতীর্ণের অন্যতম উদ্দেশ্য হল মানুষকে তাকওয়ার বিষয় সচেতন করে

দেয়া। পবিত্র কুরআনে তাই ধ্বনিত হচ্ছে , “হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্য আমি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। এটা তাদের জন্য উপদেশ স্বরূপ যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।”[176]

মানুষের পরিপূর্ণ সফলতা হচ্ছে পরকালীন সফলতা। আর এটা একমাত্র তাকওয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। সূরা ত্বা-হাতে এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন- “ শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।”[177]

এ তাকওয়ার গুণে গুনান্বিত করার লক্ষ্যেই আল্লাহ তা ‘আলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর মানব জাতির জন্যে গাইডবুক হিসেবে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করেছেন। এটি মানুষকে তাকওয়ার পথ নির্দেশ করে চিরস্থায়ী জান্নাতে দীক্ষিত হওয়ার ব্যপারে উৎসাহ যোগায় এবং জাহান্নামের কঠিন আযাব হতে মুক্তি লাভের উপায় বাতলে দেয়। ফলে , এ মহামূল্যবান গ্রন্থে উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদানের পাশা-পাশি

---

[176] আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা : ১-২।

[177] আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা : ১৩২।

ভীতিসঞ্চারমূলক অসংখ্য বিধান ও বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছেঃ

﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾﴾ [طه: ١١٣]

"অনুরূপভাবে আমি আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি এবং এতে নানাভাবে সতর্কবাণী ব্যক্ত করেছি , যাতে তারা আল্লাহভীরু হয় অথবা তাদের অন্তরে চিন্তার খোরাক যোগায়।"[178]

---

178 আল কুরআন, সূরা ত্বা-হা : ১১৩।